

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়



বাক্-সাহিত্য (প্রাঃ) লিমিটেড্
৩৩, কলেজ রো ॥ কলিকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ—বৈশাখ, ১৩৭৯

প্রকাশক :
শ্রীসুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
বাক্‌-সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড
৩৩, কলেজ রো,
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :
শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ
শ্রীহরি প্রেস
১৩৫-এ, মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭

প্রচ্ছদপট :
শ্যামল নন্দী

চার টাকা

॥ এক ॥

জীবনে, কোনোদিন, ওঁর সঙ্গে আর আমার দেখাই হত না—যদি হাতের ঘড়িটার কাচ হঠাৎ দু'টুকরো হয়ে ভেঙে না পড়ত। ঘড়িটার কোনো দোষ ছিল না। কাচে খানিক ফাটল ধরেছিল মাসখানেক আগেই। কিন্তু বাঙালীর চরিত্রে যেমন হয়, চলছে, চলুক—কোনো এক সময় দোকানে ঢুকে বদলে নিলেই চলবে। কয়েক মিনিটের তো ব্যাপার।

এই কয়েক মিনিট মাস চারেকের মধ্যে আমি আর খুঁজে পাই নি। চাকরি করেছি, বাজার করেছি, ট্রামে-বাসে ওঠানামা করেছি, আড্ডা দিয়েছি, ময়দানের এক-আধটা 'ম্যামথ র‍্যালী'তে হাজির থেকেছি, সিনেমা দেখেছি, খেলার মাঠে গেছি আর ভেবেছি ঘড়ির কাচটা কালকেই বদলে নেওয়া উচিত—বিশ্রী একটা ক্ষতচিহ্নের মতো দেখাচ্ছে। তা ছাড়া ঘড়িটা একটু বেশিমাত্রায় কুলীন, খাস সুইজারল্যাণ্ডের লোজান শহরে কোন্ এক 'ডুবোয়া' কোম্পানির নিজস্ব লোক্যাল প্রোডাক্ট—আমার এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ার দান, আমার হাতের পক্ষে অতিশয় বেমানান। এমন একটি ঘড়িকে এভাবে কলঙ্কিত করে রাখা কিছুতেই উচিত ছিল না, অথচ বাঙালী আলস্যে এই কর্তব্যটুকু কিছুতেই করে উঠতে পারি নি আমি।

খুব সম্ভব, সেই অভিমানেই, এক ছুটন্ত দক্ষিণী ভদ্রলোকের চামড়ার ব্যাগের সামান্য একটু ধাক্কা লাগতেই কাচটা একেবারে দু'টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ল।

ভদ্রলোক লক্ষ্যও করলেন না, তাঁর সমস্ত আকাঙ্ক্ষা তখন অদূরের একটি বাসের দিকে। কিন্তু মুহূর্তের জন্যে আমি বিমূঢ় হয়ে গেলাম। তারপর আতঙ্কিত চোখে চাইলুম ঘড়িটার দিকে। না—ক্ষতিটা মারাত্মক নয়। ডায়াল অক্ষত, ঘণ্টা-মিনিটের কাঁটা রয়েছে

যথাস্থানে আর সেকেণ্ডের কাঁটাটা সরু একটা সোনালি ফড়িঙের মতো তার দ্বাদশ রাশি পরিক্রমা করে বেড়াচ্ছে।

তা হলে কাচটা এবার নিতান্তই দরকার। কলকাতা থেকে প্রায় দেড় হাজার কিলোমিটার দূরের এই শহরে প্রায় সবই আমার অচেনা, তেলুগু, তামিল আর ইংরিজি ছাড়া আর ভারতের সব ভাষা অচল, মাইল খানেক দূরে সমুদ্রের ধারে সেই বাংলোটি ছাড়া পরিচিত মুখ আর কোথাও নেই। আমি এসেছিলুম বাজারে কিছু তাজা কফি কিনতে—দিন দুই পরে কলকাতায় ফিরে যাব, আর এমন সময়—এই বিপর্যয়।

কিন্তু বাজার যখন, এবং দু'ধারে যখন রেডিয়ো-রেকর্ডপ্লেয়ার, কাট্‌লারি, জামা-কাপড় আর মণিহারী দোকান, তখন একটা ঘড়ির দোকান কাছাকাছি থাকবেই। দোকান পাওয়াও গেল : 'ডেকান টাইমকীপার্স—ওয়াচেস—ক্লকস্—ডীলার্স অ্যাণ্ড রিপেয়ারার্স।'

সারা দাক্ষিণাত্যের সময় রাখবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা যে পোষণ করে, তার দোকানের চেহারা সে পরিমাণে অতিকায় নয়—বরং নিতান্তই ছোটখাটো এবং 'ডীলার্স অ্যাণ্ড্ রিপেয়ারার্স'—এটাও গৌরবে বহুবচন বলে মনে হল। দোকানে একটিই ব্যক্তি—ভেতরে পা দিয়ে কাউন্টারের ও-ধারে একটি মাথাই আমি দেখতে পেলুম। মাথাটি নত হয়ে আছে, বড়ো বড়ো রুক্ষ চুল, কচিৎ দু-একটি কালোর আঁচড় ছাড়া বকের পাখার মতো শাদা, চোখে ঘড়িওলার চিরন্তন ম্যাগনিফায়িং গ্লাস—নিবিষ্ট মনে কিছু একটা কাজ করছিলেন।

আমার পায়ের শব্দে চোখ তুলে তাকালেন সামনের দিকে। পরচলা খুললেন চোখ থেকে। শীর্ণ মুখ। রাত-দিন বসে থেকে কাজ করতে করতে যে ক্লান্ত অবসাদ দেহে-মনে ছড়িয়ে যায়, তারই সুস্পষ্ট চিহ্ন।

একটু হাসলেন। তারপর কিছু একটা বললেন তামিল কিংবা তেলুগুতে।

সবিনয়ে ইংরিজিতে জানালুম, 'ওই মধুর ভাষাটির সঙ্গে পরিচয় নেই বলে আমি দুঃখিত। আমার এই ঘড়ির কাচটা ভেঙে গেছে, যদি দয়া করে বদলে দেন, তা হলে বাধিত হই।'

ভদ্রলোক একটু চেয়ে দেখলেন আমার দিকে। কিন্তু বাঙালীর, বিশেষ করে বাঙালের চেহারা লুকোবার বোধ হয় রাস্তা নেই কোনো। আবার হাসলেন একটু।

'বাঙালী—না?'

পরিষ্কার বাংলা উচ্চারণ।

পুলকিত হয়ে বললুম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি বাঙালী?'

'ছিলুম। এখন পুরোপুরি আছি কি না জানি না, পঁচিশ বছর তো হল এখানে। বাইরে সাইনবোর্ডে প্রোপ্রাইটরের নাম দেখেন নি? এস-কে ঘোষম্। ছিলুম ঘোষ—এখন ঘোষম্। যেখানকার যা রেওয়াজ।'

'পঁচিশ বছর রয়েছেন এখানে?'

'হিসেব করলে মাস কয়েক বেশি হবে হয়তো। আপনি কি এখানে নতুন? চাকরি নিয়ে এসেছেন? আরে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন—বসুন।'

কাউন্টারের বাইরে রেক্সিন মোড়া খান দুই চেয়ার ছিল, তারই একটাতে বসে পড়লুম, 'আমি নতুনই বটে। তবে চাকরি নিয়ে আসি নি, এসেছি বেড়াতে।'

'কোথায় উঠেছেন?'

জানালুম।

'ও—নিশীথ মুখার্জির বাংলোয়? নিশীথবাবু কে হন আপনার?'

'পিসেমশাই।'

'তাঁর ঘড়ি আমিই সারাই।'—এস-কে ঘোষম্ একটু হাসলেন: 'আমাকে চেনেন তিনি।'

বললুম, 'স্বাভাবিক।' পিসেমশাইয়ের বাংলোর বাইরে এই ক'দিন বাদে বাংলা ভাষায় কথা বলতে পেরে আমি একটু প্রগল্ভ

বোধ করলুম। সেই সঙ্গে কোথায় একটা ক্ষীণ, সুদূর অস্বস্তি আমাকে স্পর্শ করছিল, এস-কে ঘোষম্ যখন হাসছিলেন তখন আমার মনে হচ্ছিল কোথায় একটা স্মৃতি—দুপুরের রোদে নদীর বালি যেমন অভ্রের পাতের মতো কাঁপে, তেমনি করে কেঁপে চলেছে একটু একটু। আমি হয়তো কখনো তাঁকে চিনতুম—অথবা কোনোদিন চিনতুম না—কোনো চেনা মানুষের অস্পষ্ট দুটো-একটা রেখার সঙ্গে কোথাও তাঁর মিল আছে হয়তো।

আমি বলে চললুম, 'স্বাভাবিক। এখানে তো বাঙালী খুব বেশি নেই।'

'না। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ক'জন কর্মচারী, নতুন রেয়ন ফ্যাক্টরীতে জন দুই অফিসার, রেলে বোধ হয় এক ভদ্রলোক আছেন আর সদাশিবম্ রোডে কর্নেল সেনগুপ্ত—খুব নামকরা ডাক্তার। আর আমি। আলাপ হয় নি এঁদের সঙ্গে?'

'বিশেষ নয়। পরশু এক মিস্টার গুপ্ত এসেছিলেন পিসেমশাইয়ের বাংলোয়।'

'ও—কুনাল গুপ্ত। ইলেক্ট্রিক এন্‌জিনীয়র—বুঝেছি। তা আছেন ক'দিন?'

'পরশু ফিরে যাব কলকাতায়।'

'সব দেখা হয়ে গেছে? মহাবলীপুরম্—পক্ষীতীর্থ—'

বললুম, 'যতটা পারা যায়। দেখবার তো শেষ নেই। কিন্তু আমারও থাকবার উপায় নেই আর। ছুটি ফুরিয়ে গেছে।'

'কী করেন?'

'মাস্টারি।'

'খুব ভালো প্রফেশান। আমিও এক সময়—' বলতে বলতে থেমে গেলেন: দেখি ঘড়িটা?

ঘড়িটা কাউন্টারের ওপর রাখাই ছিল। তুলে নিয়ে বললেন, 'বাইরের ঘড়ি দেখছি। ভালো জিনিস। এ মেকারের ঘড়ি ভারতবর্ষে কখনো আসে না।'

বললুম, 'আমার স্ত্রী কিনে এনেছিলেন সুইজারল্যাণ্ড থেকে।'

'বুঝেছি।—তারপর একটা ড্রয়ার খুলে কাচ তুলে দেখতে লাগলেন, কোন্‌টা ফিট করে।

আমি দেওয়ালের শো-কেস ভর্তি, ছোট ছোট লেবেল-লাগানো রিপেয়ারের ঘড়ি দেখছিলুম, ক'টা পুরোনো দেওয়াল-ঘড়ি দেখছিলুম, ক্যালেণ্ডারে মহালক্ষ্মীর ছবি দেখছিলুম, কার একটা সার্টিফিকেটের মতো কী বাঁধানো রয়েছে—তা দেখছিলুম। কিন্তু আমার মনের ভেতরে—দুপুরের রোদে যেন নদীর বালি অভ্রের মতো কাঁপছিল, একজন মানুষকে একদিন চিনতুম অথবা কোনোদিন চিনতুম না অথচ তার কয়েকটা অস্পষ্ট রেখা দেখা যাচ্ছে, এইসব অনুভব করছিলুম। একটা খুব সুন্দর স্মৃতি আসতে চাইছিল, খুব ভালো লাগার কয়েকটা দিন যেন ফিরে আসতে চাইছিল—আমি যেন তারার আলোয় ভরা একটা মাঠের ভেতর দিয়ে একা হেঁটে চলেছিলুম—না—একা নয়—আমার ঠিক আগে আগে কে আর একজন হেঁটে যাচ্ছিল—সে আমার চেনা, অথচ আমি তাকে মনে করতে পারছিলুম না, তার নামটা—

এস-কে ঘোষম্‌ কথা বললেন তখন।

'না—ঠিক এই মাপের গ্লাস নেই দেখছি। তৈরি করে দিতে হবে, সময় লাগবে একটু। বিকেলে আসতে পারবেন একবার?'

তখন—তখন—অন্ধকার ঠাণ্ডা মাঠের ভেতর দিয়ে যে আমার আগে আগে হেঁটে যাচ্ছিল, যাকে আমি চিনতুম অথচ চিনতে পারছিলুম না—সে আমার দিকে মুখ ফেরালো।

অস্বস্তিতে ছটফট করে আমি বলে ফেললুম, 'আমার মনে হচ্ছে, আপনাকে কোথাও—'

এস-কে ঘোষম্‌ চোখ তুলে আমার দিকে তাকালেন কিংবা আমার মাথার পাশ দিয়ে বাইরের দিকে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিলেন, সে আমি ঠিক বলতে পারব না। তারপর খুব স্বাভাবিক আর শান্ত গলায় বললেন, 'হ্যাঁ, আমাকে তুমি চিনতে। তোমার ছেলেবেলায়।'

চমকে বললুম, 'আপনি—আপনি—'

'আমি সুমন্ত ঘোষ—তোমার সুমন্তদা। তোমার বাড়ীতে আমি থাকতুম, পড়াতুম তোমাকে, তোমার ছোট বোন দীপুকে।'—কেটে কেটে স্পষ্ট উচ্চারণে বলে চললেন, 'কিন্তু ত্রিশ বছর আগেকার কথা ভুলে যাও, মণ্টু। আমি এখন এস, কে ঘোষম্—অন্ধ্রের এই শহরে ঘড়ি সারাই।'

স্বরটা বদলে গেল তারপরেই। ঝুঁকে পড়লেন ঘড়ির ওপর। বললেন, 'বিকেলে ঘড়িটা রেডি করে রাখব। চারটে থেকে আটটার ভেতরে যখন খুশি এসে নিয়ে যাবেন।' তারপরেই রসিদ বই খুলে, পেনসিল তুলে নিয়ে বললেন, 'ইয়োর নেম অ্যাণ্ড অ্যাড্রেস স্যার—'

ত্রিশ বছরের পর্দা সরিয়ে একবারের জন্যে দেখা দিয়েই—সুমন্ত ঘোষ আবার আড়ালে লুকিয়ে গেলেন।

একটু সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালুম আমি।

বললুম, 'আচ্ছা, বিকেলেই আসব। নমস্কার।'

রসিদটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে এস-কে ঘোষম্, বললেন, 'নমস্কার।'

রাস্তায় বেরিয়ে আমি রসিদটার দিকে চেয়ে দেখলুম। লেখা রয়েছে—'নো চার্জ।'

এতক্ষণে—এতক্ষণে আমার বুকের ভেতর থেকে কান্নার মতো কী একটা ফেটে পড়তে চাইল। কী দরকার ছিল এটুকুর, এ অনুগ্রহ কে চেয়েছিল সুমন্তদার কাছে? ত্রিশ বছর আগেকার দিনগুলোকে এত সহজে, এক কথায় যিনি মুছে দিতে পারেন, কে তাঁকে বলেছিল বিনা পয়সায় আমার ঘড়ির কাচ সারিয়ে দিতে?

ইচ্ছে করল ফিরে যাই দোকানে, বলি—আমার ঘড়ি ফেরৎ দিন, কাচ আপনাকে বদলাতে হবে না। কিন্তু বলা গেল না। আমি পরাভূতের মতো একটা সাইকেল-রিক্‌শায় উঠে পড়ে বললুম, 'নীলম রোড।'

॥ দুই ॥

সমুদ্রের দিকে বারান্দায় একটা ডেক চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে আমি পঁচিশ-ত্রিশ বছরের ওপারে চলে গেলুম। সামনে বাঁধের মতো উঁচু রাস্তাটা, তাল আর নারকেলের সারি দুলছে হাওয়ায়, সেখান থেকে খানিক পাথর-বালি মেশানো ঢালু ডাঙা নেমে গেছে সমুদ্রে। এই বারান্দায় বসে ডাঙাটা দেখা যায় না—শুধু চোখে পড়ে সমুদ্র ঢেউ ভাঙছে। নিবিড় নীল তার রঙ—দীঘার সমুদ্র, পুরীর সমুদ্রের চাইতে অনেক বেশি নীল, শাদা ফেনার ফুল ফুটছে—মাঝে মাঝে পাখির ঝাঁক। শরতের আকাশে কয়েক টুকরো মেঘ থমকে আছে প্রায়—দুপুরের রোদ ঝিমোচ্ছে সাগরের নোনা হাওয়ায় তাল-নারকেলের মাথায় মাতলামো চলছে একটানা।

পিসেমশাই বেরিয়ে গেছেন অফিসে, রেডিয়োগ্রামের একটা চাপা আওয়াজ শোনা যায়, খুলে দিয়ে পিসিমা খুব সম্ভব দিবানিদ্রায় মগ্ন। ঝি-চাকরদের ছুটি এখন। বাড়ীতে আর কেউ নেই। পিসতুতো বোন রেবা কলকাতায় শ্বশুরবাড়িতে ঘর-সংসার করছে, পিসতুতো ভাই ব্রতীশ বারো বছর প্রবাসী, ফ্রান্স কিংবা ইতালী—কোথাও সে এনজিনীয়ার, ঘরে তার বিদেশিনী স্ত্রী।

শুধু রেডিয়োগ্রামে থেকে থেকে বিলিতী গানের সুর বদল। সমুদ্রের শব্দের সঙ্গে, পাতার শব্দের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে তারা। নিরবচ্ছিন্ন ধ্বনির মধ্যেও যে নৈঃশব্দ্য সৃষ্টি হয়, তাই এখন ঘিরে ধরতে লাগল আমাকে। সামনের সমুদ্র তার ঢেউ, ফেনা, ওপরের কয়েক টুকরো মেঘ আর আকাশের মুক্তি বেয়ে আমাকে অনেক দূরে নিয়ে গেল, যেখানে আমাদের বাড়ির পাশে আত্রাই নদীর জলে নৌকোতে পাল উঠেছিল, আমাদের বাগান থেকে উঠে আসছিল বৃষ্টিভেজা কামিন' ফুলের গন্ধ।

তখন স্মৃতিরা ছবি হয়ে এল। সমুদ্রের ওপর পাখিদের মতো সেই সব দিন।

সুমন্তদা কী করে আমাদের বাড়িতে এসে পৌঁছেছিলেন, সে আমি বলতে পারব না।

এইটুকু কেবল জানতুম, তিনি আমাদের দেশের লোক। বাবা না হয় চাকরির সূত্রে এসেছিলেন উত্তর বাংলার এই দূর অঞ্চলে, তাঁকে আসতে হয়েছিল, কিন্তু পূর্ব বাংলার সেই গ্রাম থেকে, স্টিমারে, ট্রেনে অতখানি পথ পার হয়ে, তারপর গোরুর গাড়িতে কুড়ি-বাইশ মাইল পাড়ি দিয়ে কী উপায়ে তিনি এখানে এসে পৌঁছুলেন, ভাবতেও আমার ধাঁধা লাগে।

কেবল এইটুকু জানতুম যে সুমন্তদার কেউ নেই। বাড়ির অবস্থাও ভালো নয়। ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়েছিলেন, পাশ করতে পারেন নি—কিংবা বোধ হয় পরীক্ষা দেওয়া হয় নি কোনো কারণে। সুমন্তদার বাবাকে আমার বাবা দাদা বলতেন, ভালোও বাসতেন, হয়তো সেই সূত্রে কোথাও থাকবার একটা জায়গা খুঁজতে খুঁজতে এসে পড়েছিলেন আমাদের কাছে। কিংবা বাবাই হয়তো তাঁকে আসবার জন্যে চিঠি দিয়েছিলেন।

কারণ যাই হোক, সুমন্তদা এসে পড়েছিলেন।

গোরুর গাড়ি থেকে নেমেছিলেন, এইটুকু ঝাপসা মনে আছে। গায়ে ময়লা হাফশার্ট ছিল, পরণে মালকোচা করা ধুতি, খোঁচা খোঁচা দাড়ি ছিল গালে, এক মুখ হাসি ছিল।

সেই সময় বাড়ির সামনের কদম গাছটা ফুলে ফুলে ভরে গিয়েছিল। আমার ছোট বোন দীপু অর্থাৎ দীপিকা আমাকে বলছিল, 'দাদা, দুটো কদম ফুল পেড়ে দিবি—' আর আমি ভাবছিলুম, বাড়ির ভেতর থেকে পেয়ারা পাড়বার আঁক্‌শিটা নিয়ে আসব, না বৃষ্টিভেজা গাছটায় চড়বার একটু চেষ্টা করে দেখব, এই সময়—গাড়ি থেকে টুক্ করে নেমে পড়ল সুমন্তদা।

গাড়িতে বসেই দীপুর প্রার্থনা শুনেছিলেন, না নিজেই আন্দাজ

করেছিলেন, বলতে পারব না। একবার তাকিয়ে দেখলেন দু'জনের দিকে। তারপর :—

'কী খুকি, কদমফুল চাই? আচ্ছা, আমি দিচ্ছি—'

বলবার অপেক্ষা মাত্র। তারপরেই খাস বরিশালের নারকেল-সুপুরির গাছে ওঠার নৈপুণ্যে তড়াক করে উঠে পড়লেন কদম গাছে ঝুপ-ঝুপ করে ডাল-পাতা শুদ্ধু একরাশ কদমফুল নেমে এল নিচে।

'চাই আর?'

আমরা ভাই-বোনে থ। এমন সময় মা বেরিয়ে এলেন দরজায়। তেমনি এক লাফে নেমে পড়লেন সুমন্তদা, তারপরে মা-র পায়ে একেবারে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম।

মা হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। প্রণাম সেরে উঠে একগাল হেসে সুমন্তদা বললেন, 'আমাকে চিনতে পারলেন না খুড়িমা? আমি সুমন্ত, পিংলাকাঠির সুমন্ত।'

মা বললেন, 'ও—তুই? তোকে তো আমি কতটুকু দেখেছিলুম। আয়—আয় ভেতরে আয়।'

'গাড়িতে বাক্স-বিছানা আছে খুড়িমা, নামাই।'

'সে নামাবার লোক আছে, তুই আয় ভেতরে।'

ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে সুমন্তদা বললে, 'সারা রাত্তির গোরুর গাড়ির ঝাঁকুনিতে সন্ধ্যেবেলায় যা খেয়েছি, তা কখন হজম হয়ে গেছে খুড়িমা। চিঁড়েমুড়ি-নারকেলের নাড়ু যা আছে, তাই একধামা এখন বের করুন আগে।'

দীপু এক চোখ অতল বিস্ময় নিয়ে তাকালো আমার দিকে।

'কে রে দাদা?'

'জানি না তো।'

'খুব মজার লোক না দাদা? কত ফুল পেড়ে দিয়েছে।' —ফুলগুলো কুড়োতে কুড়োতে দীপু হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল : 'আর ভীষণ পেটুক—না রে? এসেই একধামা চিঁড়ে-মুড়ি খেতে চাইল।'

'হু।'

এই ভাবেই সুমন্তদার আবির্ভাব হল আমাদের বাসায়। আর কয়েকদিনের মধ্যেই দেখা গেল, আমাদের এখানে সুমন্তদা একেবারে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ সে যে এতদিন এখানে ছিল না, কথাটাই আর ভাবা চলে না এখন। তার প্রধান কাজটা ছিল বোধ করি আমাদের পড়ানো।

এ পর্যন্ত আমাদের প্রাইভেট টিউটরের দরকার হয় নি। দীপুর ইংরিজি তখন 'এ বিগ ফিগ', 'এ ফ্যাট্ ক্যাট্' পর্যন্ত, আমি আর একটু এগিয়ে লেট লতিফে'র সেই সব উপদেশপূর্ণ গল্প-টল্প পড়ি। খুব উৎসাহ নিয়ে আমাদের পড়ায় সুমন্তদা।

চড়-চাপড়ের কারবার নেই, বকুনি-টকুনিও না। আসলে আমরা দু' ভাইবোনই ছিলুম সুশীল-সুবোধ, সুমন্তদাকে বিশেষ কিছু করতে হত না, আমরাই চেঁচিয়ে মাত করে রাখতুম।

বরং সুমন্তদাই উসখুস করত। অত পড়া ভালো লাগত না তার।

'এ স্লাই ফক্স মেট এ হেন—স্লাই কি সুমন্তদা?'—দীপু জানতে চাইল।

'স্লাই? ধূর্ত। খ্যাঁক্‌শেয়ালগুলো ভীষণ পাজী হয়, তা জানিস?'

অঙ্কে আমার নিদারুণ অরুচি আর সেই মুহূর্তে হয়তো প্রকাণ্ড একটা গুণের অঙ্ক কষতে হচ্ছিল আমাকে। আমি তৎক্ষণাৎ স্লেট থেকে মাথা তুললুম।

'আমি জানি। আমাদের হাঁস চুরি করে খেয়েছে।'

'আরে হাঁস-মুরগী-ছাগলছানা এসব তো খাবেই। গাছ থেকে পাকা কাঁঠাল পর্যন্ত নামিয়ে খায় ওরা।'

'দুৎ!'—দীপুর অবিশ্বাস: 'কাঁঠাল নামাবে কী করে? ওরা কি বানর? ওরা কি গাছে উঠতে পারে?'

'গাছে ওদের উঠতে হয় না। অনেক সময় দেখেছিস তো খুব নিচু পর্যন্ত কাঁঠাল হয় কোনো-কোনো গাছে। সেগুলো পাকলে

এক দঙ্গল শেয়াল এসে যায় দল বেঁধে। তখন একটার কাঁধে আর একটা ওঠে, তার কাঁধে আর একটা, তার কাঁধে আর একটা—এমনি করে উঁচু হয়ে কাঁঠালের কাছে পৌঁছে যায়। তখন ওপরের শেয়ালটা পাকা কাঁঠাল টেনে নামায়, আর সবাই মিলে—'

তারপর পুরো দশ মিনিট শেয়ালের বুদ্ধি নিয়ে আলোচনা।

অমনোযোগী ছাত্রকে ধমক দিয়ে পড়ায় মন বসাতে হয় মাস্টারের। কিন্তু আমাদের বেলায় ঠিক উল্‌টো। আমরা ভাই বোনে চ্যাঁ চ্যাঁ করে একটানা এমন পড়ে যেতুম যে বিরক্তি ধরে যেত সুমন্তদার।

"সতীশেরা বড়লোক, কত টাকাকড়ি,
কত যে দালানকোঠা, দ্বারেতে প্রহরী।
সকলেই মানে গণে, ভালোবাসে সবে,
ভালো খায়—ভালো পরে, কত সুখ তবে—'

বাংলা কবিতা হলে তো কথাই নেই, আমার চিৎকার গগনভেদী হতে থাকত। এখন বেশ বুঝতে পারি, অস্বস্তিতে ছটফট করত সুমন্তদা।

"জিজ্ঞাসিলা পিতা তবে সতীশের কাছে ঃ
বড় লোক হতে বাছা ইচ্ছা তব আছে ?
শুন শুন কি হইলে বড় লোক হয়—
বড় লোক হওয়া বাছা সোজা কথা নয়।
মন দিয়া লেখো পড়ো যত্নে অতিশয়—"

'উঃ, একটু থামতো মন্টু! কাণের পোকা বেরিয়ে গেল যে!'

'চেঁচিয়ে না পড়লে যে মুখস্থ হয় না সুমন্তদা। আর মুখস্থ না হলে থার্ড মাস্টার—'

'আরে রেখে দে তোর থার্ড মাস্টার!'—সুমন্তদার মুখে তাচ্ছিল্য ফুটে বেরুত ঃ 'এই কবিতা মুখস্থ হলেই যদি বড় লোক হওয়া যেত, তা হলে আর তোদের থার্ড মাস্টার কুড়ি টাকা মাইনের চাকরি

করত না। আসলে কী জানিস,—বরাত—বরাত! জানিস, নবগঞ্জের পালেদের কী হয়েছিল?'

রইল সতীশের পিতার উপদেশ। বইয়ের পাতা বন্ধ হল, ভালো ভালো কথাগুলো চাপা পড়ল আপার্তত শুরু হল আর এক জগতের গল্প।

সে এক ফুটফুটে জ্যোৎস্না রাত। নবগঞ্জের পালেরা দু' ভাই ফিরছিল হাট সেরে। ভারী গরীব তারা, তরী-তরকারী বেচে দিন যায় কি যায় না। কখনো-কখনো দু-একবেলা উপোস পর্যন্ত দিতে হয় তাদের।

আজ হাটে ভারী লোকসান গেছে। অর্ধেক দামে বেচতে হয়েছে কচু-কুমড়ো। এর পর আর ব্যবসা চলবে না। দু' ভাই পদ্মার ওপর দিয়ে নৌকো বাইতে বাইতে ঘরে ফিরছিল আর ভাবছিল, কী হবে।

বড়ো পাল চোখের জল মুছতে মুছতে বললে, এ কষ্ট তো আর সহ্য হয় না। ইচ্ছে করছে পদ্মার জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করি।

ঠিক সেই সময়।

ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় দু' ভাই শুনল ঝনঝন করে মোহরের শব্দ। যেন যক্ষের ভাণ্ডারে টাকা গুণছে কেউ।

কিন্তু যক্ষ নয়। উঁচু পাড়ি ভেঙে পড়ছিল ভরা বর্ষার পদ্মার স্রোতে—ভেঙে পড়ছিল পুরোনো আমলের বিক্রমপুর। পালেরা দেখল, সেই ভাঙনের মধ্যে মাটির তলা থেকে ঝুর ঝুর করে মোহর পড়ছে পদ্মার জলে—যেন জ্যোৎস্নায় ঝকমক করছে সোনার ঝর্ণা।

দু' ভাই প্রথমে কাঠ। ভাবল, ভূতুড়ে কাণ্ড! তারপর মনে করল, যা হওয়ার তা হোক। এমনিই তো না খেয়ে মরছি, না হয় ভূতের হাতেই মরব। আর যদি কিছু মোহর পাওয়া যায়—

তারা নৌকো ভিড়িয়ে দিলে সেই সোনার ঝর্ণার কাছে। নৌকো ভরে মোহর ঝরে পড়তে লাগল, এত বড়ো বড়ো আকবরী মোহর। তারপর—

তারপর যা হয় রূপকথায়। আকাশ-ছোঁয়া দালানকোঠা, জমিদারী—দেশজোড়া ব্যবসা, কী আর বাকী রইল ?

এমনি করে সুমন্তদা আমাদের পড়া নষ্ট করত।

নষ্ট করত ? না। পড়ার বইয়ের বাইরে সুমন্তদা আমাদের, অন্তত আমার মনকে অনেক দূর-দূরান্তের খবর দিত। কবে সে গিয়েছিল সুসংয়ের পাহাড়ে—দূর থেকে শুনেছিল বুনো হাতির ডাক ; কবে কালাবদরের বিশাল কালো জলের ওপর নৌকো প্রলয়-ঝড়ে পড়েছিল—ডুবে যেত আর একটু হলেই—সেই রোমাঞ্চকর কাহিনী ; তালের ডোঙা নিয়ে ভরা বিলের জলে টাল খেতে খেতে কী করে পাড়ি দিত, তার গল্প ; আড়িয়াল খাঁর চড়ায় কিভাবে কুমীর তার ছানাপোনা নিয়ে রোদ পোয়ায়, স্পষ্ট দেখতুম তার ছবি ; শীতকালে ভাঁটি অঞ্চলে গিয়েছিল মামাবাড়িতে —ও-সময় ওদিকে বাঘ আসে, সেই বাঘ কী করে বাড়ির কুকুরটাকে নিয়ে গেল তার শিহরণ জাগানো করুণ কাহিনী। একটা ছোট লাঠি নিয়ে কিভাবে চার হাত লম্বা 'খইয়া জাতি' (খরিশ গোখরো) সাপটাকে মেরেছিল, সেই বীরত্বের বিবরণ ; রাজাপুরের মঠ, মাধবপাশার গড় ; শিকারপুরের তারা বাড়ি—সব জীবন্ত হয়ে উঠত তার বর্ণনায়। বর্ষার দিনে বাড়ির বারান্দা পর্যন্ত জল উঠে এলে কিভাবে বল্লম ছুঁড়ে মাছ গেঁথে ফেলা হয়, সে কাহিনীও বাদ যেত না।

দীপু সব সময় এই সমস্ত গল্প যে শুনত তা নয়। পাশের বাসার ওভারশিয়ারবাবুর মেয়েরা তার খেলার সঙ্গী, ওর মন পড়ে থাকত সেদিকে। দীপুর মনে, চিন্তায় সুমন্তদার কোনো ছায়া কোথাও আছে বলে আমি জানি না। আজ কলকাতায় ফিরে, দীপুর বাড়িতে গিয়ে যদি জিজ্ঞেস করি : 'সুমন্তদার সঙ্গে দেখা হল, মনে পড়ে তাঁকে ?' ব্যস্ত গৃহিণী দীপু একবার কপাল কুঁচকে, আশ্চর্য হয়ে বলবে : 'সুমন্তদা ? কে সে ?'

ও আমার চাইতে তিন বছরের ছোট। কাজেই যে সুমন্তদা

বছর তিনেক ধরে আমাদের বাসায় ছিল, তাকে স্মৃতিতে ধরে রাখবার বয়েস হয়তো ওর তখনো আসে নি। তা ছাড়া সুমন্তদা ওর কাছে একটা অংশ মাত্র, ওর সঙ্গিনীরা ছিল, পুতুলের সংসার ছিল, আর রাত দিন তো মা-র পায়ে পায়েই ঘুরত। কিন্তু সুমন্তদাকে আমি সর্বদা কাছে পেতুম, এক সঙ্গে থাকতুম, এক সঙ্গে ঘুরে বেড়াতুম। ছেলেবেলায় আমি বেশি মিশতে পারতুম না, একা-একা থাকবার অদ্ভুত নেশা ছিল আমার, আত্রাইয়ের ধারে, পলাশের বনে, মাঠের ওপারে পদ্ম-দীঘির ধারে ধারে নিঃসঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়াতুম। সেই সময় সুমন্তদা আমাকে সঙ্গ দিয়েছিল, একাকার হয়ে গিয়েছিল জীবনের সঙ্গে। আমার স্মৃতিটাও খুব অস্বস্তিকর—কোনো জিনিসকে সে সহজে ছেড়ে দিতে চায় না—আজ ত্রিশ বছর পরে—ঝিমধরা দুপুরে—সামনের নিবিড় নীল সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আমি আমার ছেলেবেলাকে টানা একটা ফিল্মের মতো দেখতে পাচ্ছি।

দেখতে পাচ্ছি, বাড়িতে সুমন্তদা অপরিহার্য। যে-কোনো কাজ-কর্মে আগে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

‘কোনো ভাবনা নেই খুড়িমা, আমি আছি।’

চাকরের জ্বর? ঠিক আছে। ধামা মাথায় তুলে হাট করে নিয়ে এল। চালের ওপর থেকে কুমড়ো কেটে নামাতে হবে? ঠিক তিন মিনিটের ওয়াস্তা। মাইল চারেক হেঁটে একটা জরুরি খবর দিয়ে আসতে হবে এই রাত্রে? ‘বহুৎ আচ্ছা—দিন আমাকে একটা লণ্ঠন আর একখানা লাঠি—আমি বেরিয়ে পড়ছি।’

আর দেখছি, ভোরবেলায়, আমরা চোখে জল দিয়ে পড়তে বসার আগেই উঠোনে ইট পেতে সুমন্তদা হুশ-হুশ করে ডন দিচ্ছে। তারপর বারান্দার লোহার থাম ধরে গোটা কয়েক বৈঠ্‌কী।

‘আয়—আয় ডন-বৈঠক লাগা। হেল্‌থ্‌ ইজ্‌ ওয়েল্‌থ—মানে স্বাস্থ্যই ঐশ্বর্য। সতীশের বাবার উপদেশে কিচ্ছু হবে না বুঝলি—যদি সারা জীবন রোগা টিঙটিঙে হয়ে থাকিস!’

ডন দিতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ি।

'ট্রাই ট্রাই এগেন! চেষ্টা করতে করতে হয়ে যাবে। কালই তো ইংরিজি কবিতা পড়ছিলি :

Standing at the foot boys,
looking at this sky,
How can you get up boys,
if you never try ?

চেষ্টা না করলে কিছু হয় ?'

সিদ্ধিলাভ করতে একটু সময় লাগে অবশ্য। তবু এক রকম করে ডনটা আয়ত্তে এসে যায়।

'উঁহু, অত কষ্ট করে নয়। ঈজি—ঈজি। দু-বারের পরে তিনবারেই তো দেখছি ডানা ভেঙে পড়ে গেলি। ঝাঁ-ঝাঁ করে স্পীডে ডন দিয়ে যাবি। এই ছাখ্—ওয়ান-টু-থ্রী-ফোর—'

যেন একটা মেশিন চলতে থাকে সামনে।

সুমন্তদার উপদেশে আমি স্বাস্থ্যের ঐশ্বর্য লাভ করতে পারি নি, সতীশের বাবার কাছ থেকেও দালান-কোঠা দাস-দাসী লাভের বাণী কাজে লাগাতে পারি নি আমার জীবনে। তবু আমার প্রত্যেকটা দিন সুমন্তদার স্মৃতি দিয়ে গাঁথা তখন।

এক কথায় মানুষটি ছিল সব দিক থেকে মুগ্ধ করার মতো। রূপ কাকে বলে সেটা বোঝবার বয়েস আমার ছিল না, কিন্তু এটা বুঝতে পারতুম, স্বাস্থ্যে আর দীপ্তিতে মানুষটি ঝকঝক করছে।

কোন্ দিকে যে মাথা খেলত না, জানি না। কিছু কাঠ-কুটো, ক'টা পেরেক আর একটা হাতুড়ী পেলেই যা হোক একটা বানিয়ে ফেলতে পারত। একটা বাতিল পুরোনো টাইমপীস ছিল, ইচ্ছে মতো বন্ধ হয়ে যেত—সেটাকে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল একটা কুলুঙ্গির ভেতরে। সেটাকে টেনে বের করে কী কুটকাট করল, মা-র সেলাই কলের ফানেল থেকে তেল ঢালল খানিকটা, বেশ টিকিস টিকিস করে চলতে লাগল ঘড়িটা। দীপুর 'মাঘ মণ্ডল'

ব্রতের কয়েকটা পুতুল এমন নিটোল হাতে গড়ে দিলে যে মা স্তম্ভিত।

'তুই আগের জন্মে মেয়ে ছিলি নাকি রে?'

'আমি সব কাজ পারি' খুড়িমা কায়েতের ছেলে, হেঁশেল তো ছুঁতে দেবে না, নইলে একদিন এমন রান্না করে দিতুম যে খেয়ে বলতে—হ্যাঁ!'

এমন মানুষের ভক্ত না হয়ে কে থাকতে পারে?

বাইরের যে ঘরটিতে সুমন্তদা শুতো, সেখানে তার মাথার সামনে টাঙানো থাকত স্বামী বিবেকানন্দের একটা ছবি। রাত্রে যখন ঘরের বড়ো খাটে, জানলার ধারে শুয়ে—কদমগাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে একরাশ জ্বলজ্বলে তারা দেখতে দেখতে ঘুমে জড়িয়ে আসত আমার দু' চোখ, তখন যেন অনেক দূর থেকে—সামনের এই সমুদ্রের গর্জনের মতো আমার কানে মন্ত্রোচ্চারণের শব্দ ভেসে আসত গম্ভীর আবেগভরা গলায় বিবেকানন্দের কবিতা:

"Say Sanyasin bold—
Om, Tat Sat Om"

॥ তিন ॥

বারোয়ারীতলার দুর্গাপূজোয় যাত্রার আয়োজন।

যাত্রার দলের গরুর গাড়ি এসে পৌছুবার পর থেকেই আনন্দে এবং রোমাঞ্চে আমাদের উৎকণ্ঠিত প্রহর কাটছে। মাঝে মাঝেই বাসনা জাগছে আশপাশে গিয়ে এক-আধটু উঁকি-ঝুঁকি দিই, কিন্তু বাড়ির কড়া নিষেধ। সেজে-গুজে মা-বাবার সঙ্গে যেতে হল সেই সন্ধ্যেবেলায়, যখন বেহালায় পড়েছে ছড়ের টান, প্যাঁ পোঁ করছে হার্মোনিয়াম, মাঝে মাঝে এক-আধটা বোল উঠছে ডুগী-তবলায়।

তারপর সেই মায়ামঞ্চের অদৃশ্য যবনিকা উঠে গেল। এলেন রাজা-রাণী, তলোয়ার ঝনঝনিয়ে এলেন সেনাপতি, দেখা দিল সখীর দল।

রাজা-রাণী কোথায় লাগে, গেরুয়া-রঙের পোশাক আর মাথায় পাগড়ী বাঁধা বিবেক এসে ছোটরাণীর দিকে আঙুল বাড়িয়ে গান গাইছে : 'ও যে মনমোহিনী কালনাগিনী কণ্ঠ যে ওর ভরা বিষে'— তাও কিছুমাত্র শিহরণ জাগাচ্ছে না। সখীরা এলেই আমি বিমোহিত হয়ে যাচ্ছি। গায়ে শলমা-চুমকির পোশাক, হাঁটু পর্যন্ত খাকী মোজা, তার ওপর ঘুঙুর। নেচে গেয়ে তারাই মাতিয়ে দিচ্ছিল : 'আজি মধুরাতে, ভরা জ্যোছনাতে'—

আর অপেক্ষায় আমি কখন যুদ্ধ বাধে।

বাধবেই যে তাতে সন্দেহ মাত্র নেই। কারণ সেনাপতি দুর্জয় সিংহ যেভাবে চোখ পাকিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন এবং তলোয়ার ঝঙ্কার তুলছেন, তাতে একটা কিছু না ঘটেই যায় না। ওদিকে রুদ্র সিংহ বলে কান পর্যন্ত গোঁফওলা যে লোকটা ছোটরাণীর সঙ্গে সন্দেহজনকভাবে শলা-পরামর্শ করছে, তাতে বোঝা যাচ্ছে, এই দুর্জয় সিংহ আর রুদ্র সিংহের মধ্যেই যুদ্ধটা বাধল বলে। আমি

আগেও যাত্রা দেখেছি—বেশ বুঝতে পারছিলুম, যুদ্ধের বাজনা বাজতে বেশি দেরী নেই আর।

তারপর সড়াক সড়াক করে তলোয়ার বেরুবে। ঝাড়ের আলোয় বিজলী দেখতে থাকবে। একজন বলবে: 'আয় দেখি, কত শক্তি ধরিস বাহুতে'—আর একজন বলবে: 'ওরে রে পামর, মোর হাতে হবে তোর নিশ্চয় মরণ—।' তলোয়ার খেলতে খেলতে দু'জনে বেরিয়ে যাবে আসর থেকে, বাজনা আরো ঘোরতর হবে, আবার ফিরে আসবে যোদ্ধারা—

দুর্জয় সিংহ গর্জন করে বেরিয়ে গেল, দু' কান খাড়া করে আমি উঠে বসলুম। আর সেই সময় আমার পাশ থেকে হাই তুলে সুমন্তদা বললে, দূর, কোনো মানেই হয় না এর। শুয়ে পড়ি গে যাই।'

আমি শুনে নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলুম না।

যাত্রার আসর ছেড়ে এমন সময় উঠে যেতে পারে কেউ, এই ঘোরতর মুহূর্তে? যখন আমাদের রক্ত প্রায় টগবগ করে ফোটবার উপক্রম, তখন কারো ঘুম আসতে পারে? আসা সম্ভব? যখন যুদ্ধের বাজনা প্রায় বাজে বাজে, তখন বলতে পারে কেউ: 'দূর কোনো মানেই হয় না—শুয়ে পড়ি গে?'

আমি চমকে বললুম 'সে কি, এখনি যুদ্ধ শুরু হবে যে!'

'হুঁ, টিনের তলোয়ারের যুদ্ধ! তোরাই ওসব ত্থাখ্ বসে বসে, আমার ভালো লাগবে না।'

আমার স্তম্ভিত অবস্থা যখন কাটল, তখন সুমন্তদা মা-র কাছ থেকে চাবিটা চেয়ে নিয়ে বাসায় চলে গেছে। এদিকে সামনের আসরে 'রে-রে-রে পামর', ভয়ঙ্কর বাজনা আর ঘন ঘন তলোয়ারের ঝিলিক। সেই মুহূর্তে তখন সুমন্তদার রহস্য বোঝবার আর সময় নেই।

সেটা বোঝা গেল পরদিন।

বেলা সাড়ে এগারোটায়, সারারাত জেগে থাকার ঘুমটা পুষিয়ে

নিয়ে, চোখ কচলাতে কচলাতে উঠে দেখি, উঠোনে সুমন্তদা বসে বসে ছোট কাঠের টুকরো দিয়ে কী একটা তৈরি করছে।

'কী ওটা সুমন্তদা?'

'খরগোসের খাঁচা।'

'খরগোস? কোথায় খরগোস?'—অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে তাকালুম চার-দিকে।

'আসবে, আসবে ব্যস্ত কেন? সাঁওতালেরা ধরে, ওদের বলে রেখেছি, কাল দিয়ে যাবে দুটো। সেইজন্যে করে রাখছি খাঁচাটা।'

—হাতুড়ি, বাটালি, পেরেক—সব গুছিয়ে নিয়ে সুমন্তদা বললে, 'এখন এই পর্যন্ত থাক, বিকেলে শেষ করা যাবে বাকীটা। একটুখানি তারের জাল কিনে আনতে হবে পূর্ণ কুণ্ডুর দোকান থেকে।'

তখন আমার রাত্রির কথাটা মনে পড়ে গেল।

'সুমন্তদা, কী ভীষণ যুদ্ধ হল, আপনি দেখলেন না শেষ পর্যন্ত সেই পাজী সেনাপতিটা—'

'দূর—ও আবার যাত্রা নাকি। খালি ছেলেভুলোনো ব্যাপার।'

'ছেলেভুলোনো! কেন?'—আমার বিস্ময় অপার: 'সবাই তো বলছিল খুব ভালো যাত্রা। আজকে আছে "সুরথ উদ্ধার"—সে নাকি আরো ভালো।'

'সব বাজে—সব বাজে। আসল যাত্রা হল মুকুন্দ দাসের।'

'মুকুন্দ দাস!'

'নাম শুনিস নি তো? কী করে শুনবি? জিজ্ঞেস করিস কাকামণিকে (আমার বাবাকে)। সেই হল আসল যাত্রা। রক্ত গরম হয়ে যায়, প্রাণ ধড় ফড় করে—মনে হয়, এখুনি একটা কিছু করে ফেলি।'

'কী করে ফেলবেন সুমন্তদা?'

'প্রাণ-বিসর্জন। আত্মদান।'

আমি হাঁ করে রইলুম।

কথা বলতে বলতে আমরা বেরিয়ে এসেছিলুম বাইরে। একটু দূরে আত্রাই দেখা যায়। আশ্বিনের ভরা নদীর জল এখন ঘন নীল। গ্রামের গঞ্জে মহাজনী নৌকোর ভীড়! দুপুরের রোদে মাথার ওপর শঙ্খচিলের পাখা।

সেই নদী, আকাশ আর রোদের দিকে তাকিয়ে সুমন্তদার চোখে ঘোর লাগল।

'মুকুন্দ দাসের যাত্রা আলাদা। এ-সব তলোয়ারবাজী আর মোজাপরা সখীদের নাচ নেই সেখানে। তাতে স্বদেশের কথা। পরাধীন ভারতবর্ষের কথা। আর সেই সব গান!'—হঠাৎ গলা খুলে গেল সুমন্তদার :

'জাগো জাগো জননী,
তুই না জাগিলে শ্যামা কেহ
জাগিবে না
তুই না জাগিলে শ্যামা
পোহাবে না রজনী—'

আমি আশ্চর্য হয়ে গেলুম। এর আগে গুন গুন করে সুমন্তদাকে গান গাইতে শুনেছি বটে, কিন্তু তিনি যে এমন দরাজ গলায় গাইতে পারেন, সে আমি জানতুম না।

'ডেকে ডেকে হলেম সারা
কেউ সাড়া দিলে না মা,
বুঝে দেখলাম সবারি মন,
কেউ ফিরে তো চাইলে না।
তুই না নাচিলে শ্যামা
নাচিবেনা ধমনী
তুই না জাগিলে শ্যামা,
পোহাবে না রজনী—'

আমি স্তব্ধ। অদ্ভুত লাগছিল সুরটা। যেন থরথরিয়ে কাঁপিয়ে দেয় বুকটা।

গান শেষ করে সুমন্তদা বললে, 'মণ্টু !'

'অ্যাঁ ?'

'মানুষ হয়ে বেঁচে কী লাভ, যদি দেশের কাজ করা না যায় ?'

এতক্ষণে ব্যাপারটা একটু স্পষ্ট চেহারা নিল আমার সামনে। খদ্দরের টুপি পরা ক'জন কংগ্রেসের ভলান্টীয়ারকে আমি দেখেছি— আমাদের এখানেই দেখেছি। তারা চার-পাঁচজন একদিন 'বন্দে মাতরম্—বন্দে মাতরম্ বলতে বলতে আমাদের বাড়ির সামনে দিয়েই কোথায় চলে যাচ্ছিল।'

'তুমি কংগ্রেসের ভলান্টীয়ার হবে না ?'

'দূর, ভলানটীয়ার হয়ে কী হবে ? ও-সব নয়। চাই স্বামীজীর আদর্শ। বীর হতে হবে। শক্তি চাই। সেবক হতে হবে —দীক্ষা নিতে হবে মায়ের মন্ত্রে।

সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে
বাঁধে বাহুপাশে
কালনৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা
তারি কাছে আসে।

'বুঝেছিস্ ?'

কিছু যে স্পষ্ট করে বোঝা গেল তা নয়, কিন্তু আমি রোমাঞ্চিত হলুম। মনে হল, সুমন্তদা কেবল আমাদের বরিশাল জেলার লোক নন, শুধু যে ম্যাট্রিক পরীক্ষা না দিয়ে—বাড়ির অবস্থা খারাপ বলে ঘুরতে ঘুরতে আমাদের এখানে চলে এসেছেন তা নয়, আমাদের পড়াতে বসান—নিপুণ হাতে নানা রকম কাজ কর্ম করতে পারেন— আমাদের বাসায় তার এই সব গুণের জন্য মা-র একান্ত প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছেন, শুধু তা-ও নয়। সুমন্তদা অনেক দূরের, অনেক বড়ো, ইতিহাসের রাণা প্রতাপের গল্পে যেমন পড়েছি, তেমনি করে দেশের জন্যে একদিন প্রাণ দেবেন তিনি।

একটু চুপ করে থেকে সুমন্তদা বললে, 'স্বামী বিবেকানন্দের কথা জানিস ?'

বললুম, 'আমাদের বাসায় তো বাঁধানো ছবি আছে তাঁর।'

'আহা, ছবি তো থাকবেই। সেটা বড়ো কথা নয়। কিছু জানিস তাঁর সম্পর্কে?'

ভেবে মনে করতে হল। বাবার মুখ থেকে যেন ক'টা কথা শুনেছিলুম একবার।

'স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় গিয়েছিলেন। সেখানে মস্ত একটা সভায় যোগ দিয়েছিলেন তিনি। বক্তৃতা করে বলেছিলেন—মাই ব্রাদার্স অ্যাণ্ড্ সিস্টার্স, আর—আর সবাই খুবই অবাক হয়ে গিয়েছিল।'

একটা চাপা হাসি ফুটল সুমন্তদার মুখে।

'অনেক জানিস দেখছি তা হলে। তারপর?'

মুশকিলে পড়া গেল। এর বেশি কিছু মনে এল না আর।

বললুম, 'খুব বড়ো সাধু হয়েছিলেন।'

'ব্যস?'

আমি চুপ করে রইলুম।

'বোস এখানে।'

সবুজ নিবিড় পাতায় ছাওয়া প্রকাণ্ড নিমগাছ একটা। আত্রাইয়ের হাওয়ায় ঝির ঝির করে তার পাতা কাঁপছিল। আমি আর সুমন্তদা বসলুম তার তলায়।

সুমন্তদা একটু একটু করে বলে যেতে লাগল স্বামীজীর কথা। 'ভুলিয়ো না, মায়ের জন্য তুমি বলি প্রদত্ত।' 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।' 'বলো, দরিদ্র ভারতবাসী আমার ভাই।' 'ছিন্নকণ্ঠ ছাগের রুধির, দেখে তোর হিয়া কাঁপে? কাপুরুষ—ভয়ের আধার—'

এই কথাগুলো সেদিন স্পষ্ট করে মনে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল তা নয়। পরে বড়ো হয়ে যখন বিবেকানন্দের লেখা পড়েছি, ভেবেছি সুমন্তদা-র কথা—সেদিন সব অস্পষ্ট রেখাগুলো একটু একটু করে ভরে উঠেছে। পড়েছি ইংরিজিতে 'কালী দ্য মাদার'—সত্যেন

দত্তের বাংলা অনুবাদ, সুমন্তদার ছাড়া ছাড়া কথাগুলোর স্মৃতি নিয়েছে সম্পূর্ণ রূপ একটা। বুঝেছি, আত্রাইয়ের ধারে, শরতের রোদে সেদিন অমন করে কেন জ্বলে উঠেছিল সুমন্তদার চোখ, কেন আমার মনে হয়েছিল—সুমন্তদা অনেক বড়ো, আমাদের ছাড়িয়ে অত বড়ো হয়ে গেছেন তিনি।

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপ করে বসেছিলুম আমরা। তারপর সুমন্তদা আস্তে আস্তে বলেছিল, 'মণ্ট!'

'অ্যাঁ।'

'তোকে একটা কথা বলব আজ। কাউকে বলবি না?'

দু'জনের বয়সে অনেক তফাৎ। তবু সুমন্তদার মনের কথা বলবার জন্যে কাছে আমিই ছিলুম।

জবাব দিলুম, 'না—বলব না।'

'জানিস, তোদের এখানে কেন এসেছি আমি?'

'না।'

'ম্যাট্রিক তো দেওয়া হল না, আমি ভেবেছিলুম, সন্ন্যাসী হয়ে যাব।'

'সন্ন্যাসী!'—শুনে আমি হাঁ করলুম একটা।

'হুঁ, সন্ন্যাসী। কিন্তু ওই গাঁজাখোর ভিক্ষুক সন্ন্যাসী নয়, কিংবা হিমালয়ে গিয়ে তপস্যা করা সাধু—তা-ও নয়। স্বামীজীকে কী বলেছিলেন পরমহংস দেব? শুধু স্বার্থপরের মতো নিজের মুক্তির কথাই ভাববি? দেশজোড়া এই দরিদ্র-নারায়ণের দিকে চেয়ে দেখবি নে? স্বামীজী তাই মানব সেবাকেই করে নিলেন জীবনের ব্রত। আমিও তাই বেরিয়ে পড়েছিলুম রামকৃষ্ণ আশ্রমে সাধু হবো বলে।'—একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল সুমন্তদার: 'হল না।'

'কেন?'

'বরিশাল থেকে স্টিমারে উঠেছি—খুলনা যাব। সেখান থেকে কলকাতায়—বেলুড় মঠে। স্টিমারে ঘুমিয়ে পড়েছি। তারপর কী

হল জানিস ?'—বলতে বলতে রোমাঞ্চিত হল সুমন্তদা : 'অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলুম একটা।'

'কী স্বপ্ন ?'

'কে যেন সামনে এসে দাঁড়ালেন। মানুষটাকে চেনাই যায় না এত তেজ তাঁর শরীরে। এই যে সূর্যটার দিকে তাকানো যাচ্ছে না এখন, ঝলসে যাচ্ছে চোখ, ঠিক সেই রকম। আমি চাইতে পারলুম না। সেই মানুষটি আমায় বললেন, তোর এখনো সময় হয় নি। আরো তৈরি হতে হবে। তা ছাড়া তোর মা যতদিন বেঁচে রয়েছেন, ততদিন পর্যন্ত সংসার ছেড়ে চলে গেলে অনিষ্ট হবে তোর। সাধু হওয়ার জন্যে ভাবনা নেই—যখন সময় আসবে, ডাক শুনতে পাবি নিজের বুকের ভেতরে। বলেই একরাশ আলোর মধ্যে মিলিয়ে গেলেন তিনি। আর ঘামে নেয়ে জেগে উঠলুম আমি।'

আমি শিউরে উঠে বললুম, 'সত্যি ?'

'সত্যি না তো কী!'

ফস করে বলে ফেললুম, 'ভগবান এসেছিলেন—না সুমন্তদা ?'

'দূর বোকা! ভগবান কি অত সহজে আসেন ? কত জন্ম-জন্মান্তর সাধনা করলে তবে ভক্তেরা দর্শন পান তাঁর। এসেছিলেন কোনো মহাপুরুষ, তিনিই আমায় উপদেশ দিয়ে গেলেন।'

'তা হলে সন্ন্যাসী হওয়ার জন্যে আপনার ডাক আসবে সুমন্তদা ?'

'আসবে বই কি।'

'তখন চলে যাবেন আপনি ?'

'আমাকে যেতেই হবে।'

আবার আমরা দু'জনে চুপচাপ। নিমগাছের পাতা ঝির ঝির করছে হাওয়ায়। ঝিক ঝিক করে জ্বলছে আত্রাইয়ের নীল জল। ওপারের ঘাট থেকে একটা বোঝাই খেয়া নৌকো আসছে গঞ্জের ঘাটে।

সুমন্তদা বললে, 'মধ্যে মধ্যে মন ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। কাল যাত্রা দেখতে গিয়ে ভাবছিলুম মুকুন্দ দাসের কথা। চোখের সামনে দেখা দিলেন স্বামীজী। যাত্রা থেকে ফিরে এসে ভারী কষ্ট হচ্ছিল। কবে যে সময় আসবে, কখন ডাক পড়বে, তাই ভাবছি কাল থেকে।'

'তখন চলে যাবে চিরদিনের মতো?'

সুমন্তদা হাসল।

'ভুলে যাবেন আমাদের?'

এবারও হাসল সুমন্তদা, জবাব দিল না। তারপর বললে, 'অনেক বেলা হয়ে গেল, চল্—চান-টান করতে যাই। খুড়িমা রাগ করবেন এবার। কিন্তু যে-কথাগুলো তোকে বললুম, কাউকে বলবি নে সেগুলো।'

বললুম, 'না—না, কক্ষণো না।'

···পিসিমার ঘরে যে রেডিয়োটা একটানা বেজে চলেছিল, হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল সেটা। ঘুমের আমেজে ব্যাঘাত হচ্ছিল বলে পিসিমাই বোধ হয় বন্ধ করে দিলেন। আমার সামনে সমুদ্র—তাল-নারকেলের সার। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার মতো অবিশ্রান্ত ঢেউয়ের শব্দ। সামনের নির্জন পথটায় ধীরে ধীরে নিঃসঙ্গ এক্কা চলেছে একটা, পাকা কলায় বোঝাই। হাওয়ায় নোনা গন্ধ। এখান থেকে কত দূরে আত্রাই—কত দূরে আমার ছেলেবেলা!

জীবন এগিয়ে চলে মোহানার দিকে। সব নদী সমুদ্রে যায়—সামনের এই নীল-নীল-নীল সমুদ্রেও আত্রাইয়ের সেদিনের জল মিশে আছে কোথাও। বাজারে একটা ছোট্ট ঘড়ির দোকান। প্রোপ্রাইটর এস কে ঘোষম্। মোহানার স্রোতে আমার আগে আগে ভেসে যেতে দেখছি সুমন্তদাকে। তারপর একদিন দু'জনেই এসে মিশে যাব সমুদ্রে। যে সমুদ্রে সব নদী এসে মেশে, অথচ যে-সমুদ্রে কোনো নদীর জলকে আলাদা করে চিনে নেওয়া যায় না আর।

কিন্তু কোথায় বিবেকানন্দ ? কোথায় মুকুন্দ দাস ? এই ঘড়ির দোকানেই কি শেষ পর্যন্ত এসে মিলিয়ে গেল সন্ন্যাস ? মুখ থুবড়ে পড়ল : 'Say, Om Tat Sat om ?' দেওয়ালের সারাই ক্লকগুলোতে থেকে থেকে যখন বেসুরো সময়ের ঘণ্টা বাজে, তখন তাদের মধ্যে কি আজও শোনা যায় :

'দয়াময়ী নাম ধরিস না,
দয়া কি মা আছে তোর—
দয়া থাকলে মরে কেন
তেত্রিশ কোটি সন্তান তোর ?
তুই না নাচিলে শ্যামা—'

সমুদ্রের একটানা দীর্ঘশ্বাস। ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ।

সব দিনগুলো পর পর দেখা দেয় না। সামুদ্রিক পাখিদের মতো ঝাঁক বেঁধে ওড়ে কখনো, কখনো নীল আকাশটা একেবারে ফাঁকা। তখন কিছুই নেই।

টুপ টুপ করে কয়েকটা পাখি নেমে পড়ল সমুদ্রে, দুলতে লাগল ঢেউয়ের মাথায়। কী বলে ওদের ? পুফিন ?

আমাদের বাসা থেকে খানিক দূরে ছোট্ট ঘাসের মাঠ একটা। তার দু' ধারে বকুল গাছের সারি। এখন বকুলের সময়, অজস্র ঝরে আছে—গন্ধে ম-ম করছে হাওয়া। সেও ছুটির দিন। আমি ফুল কুড়িয়ে দিচ্ছিলুম দীপুর সাজিতে। ও মালা গাঁথবে।

এমন সময় দেখি, পাশের রাস্তা দিয়ে কোথায় যায় সুমন্তদা।

'সুমন্তদা, কোথায় চললেন ?'

'একটু ঘুরতে যাচ্ছি ওদিকে।'

'আমি যাব'—সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহিত বোধ করলুম আমি।

কারণ ছিল একটু। ওই রাস্তাটা আমার কাছে চিরদিনের বিস্ময়। এদিকে বন্দরের গঞ্জ—ওধারে থানা, স্কুল, ডাকবাংলো। আমার পরিচয়ের চৌহদ্দি এইটুকুই। কিন্তু এই যে রাস্তাটা—

ডাকবাংলোর পাশ দিয়ে চলে গেছে—শুনেছি বালুরঘাটের রাস্তা—ও আমার অচেনা স্বপ্নের পথ। দেখি গোরুর গাড়িরা ধুলো উড়িয়ে কোথা থেকে কোথায় মিলিয়ে যায়—গঞ্জ ফেরৎ সাঁওতালদের মাদলের শব্দ মিলিয়ে যেতে থাকে ওই দিকেই, রাত্রে বিছানায় বসে জানলা দিয়ে কতদিন দেখি কতদূরে এক-আধটা টিমটিমে লণ্ঠনের আলো চলতে চলতে এক হয়ে যাচ্ছে এক আকাশ তারার ভেতরে। ওই পথটা রূপকথার দেশে যায়—গোরুর গাড়ির রাঙা ধুলো, মাদলের শব্দ, রাত্রের সেই লণ্ঠনের আলোগুলো আমাকে হাতছানি দিতে থাকে।

বললুম, 'আমাকে নিয়ে চলুন না সুমন্তদা।'

সুমন্তদা বললেন, 'বাড়ি থেকে জিজ্ঞেস করে আয় তা হলে।'

'আপনার সঙ্গে যাচ্ছি, মা কিছু বলবে না।'

বাবার জন্যে ভাবনা ছিল না। বাবা সকালে উঠেই, শাদা বড় আরবী ঘোড়াটায় চেপে কোথায় চলে গেছেন জরুরী কাজে। ফিরতে রাত হবে তাঁর।

বললুম, 'দীপু, মা-কে বলে দিস আমি সুমন্তদার সঙ্গে যাচ্ছি।'

'বা রে, ফুল কুড়িয়ে দিলি না আমাকে।'

'যা-যা—পুতুলের মালার জন্যে এর বেশি ফুল লাগে না—' বলে আমি সঙ্গ নিলুম সুমন্তদার।

সুমন্তদা বললে, 'অনেক দূরে যেতে হবে কিন্তু। হাঁটতে পারবি?'

'পারব, খুব পারব!'

'ঠিক আছে। কিন্তু যদি দেখি, একটুখানি হেঁটেই বলছিস পা ব্যাথা করছে, আর চলতে পারছি না, তা হলে কিন্তু ঠাস ঠাস করে চড় বসিয়ে দেব গোটাকয়েক।

সম্পূর্ণ বাজে কথা। মধ্যে মধ্যে পড়ানোর সময় সুমন্তদার হাত কানের দিকে এগিয়ে এলে, কিংবা অঙ্ক কষবার খাতায় নারকেল গাছ আঁকবার পরে একটা চড় উঠে এলেও—সে হাত কখনো কানে

এসে পৌঁছোয় নি, সে চড় গালে নামেও নি কোনোদিন। তাই নির্ভয়ে মাথা নেড়ে আমি বললুম, 'আচ্ছা—আচ্ছা।'

বেলা গোটানয়েক বোধ হয়। রোদে ধার ছিল না, আকাশে মেঘের আসাযাওয়া। আমরা ডাক-বাংলো, তার সামনে ফুলে ভরা করবী ফুলের গাছগুলো পার হয়ে গেলুম। তারপরেই শুরু হল সেই পথটা, যে-পথে আমি কোনোদিন যাই নি যে পথ আমার স্বপ্নের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়।

'আমরা কোথায় যাচ্ছি সুমন্তদা ?'

'পাঠক-দেউলের বনে।'

পাঠক-দেউলের বন! চমক লাগল। এই দেউল, তাকে ঘিরে একটা জঙ্গল আছে সে কথা আমি জানি। সেই দেউলে অনেক কাল আগেকার ভাঙা একটা কালীমূর্তি আছে, তাও শুনেছি। কিন্তু কেউ তো সেখানে যায় না।

'বললুম, সেখানে কেন সুমন্তদা ?'

'ভয় করছে ?'

'না—না, ভয় পাব কেন ? কিন্তু সেখানে কী আছে সুমন্তদা ?'

'শতমূলী। তাই আনতে যাব।'

'শতমূলী ? সে আবার কী ?'

'এক রকম ছোট ছোট গাছ। ওষুধে লাগে।'

'আপনি ওষুধ তৈরি করবেন নাকি ?'

'দূর, আমি ও-সবের কী জানি ? আনতে যাচ্ছি কবিরাজ মশাইয়ের জন্যে।'

ঠিক কথা! সুমন্তদা এখন গঞ্জের সকলের আপনজন, সকলের সঙ্গে তার খাতির। তাকে বসে থাকতে দেখা যায় জেলা বোর্ডের ডাক্তারখানায়, ডাক্তার অমূল্য দাসের সঙ্গে ভারী ভাব জমে উঠেছে তার। গঞ্জের সব চাইতে শৌখিন লোক শশীবাবু—যাঁর মতো টেরি এখানে কারুর নেই আর যিনি সোনার ফ্রেমের চশমা পরেন—তাঁর গুড়ের আড়তেও দেখা যায় সুমন্তদাকে। সুতরাং বুড়ো কবিরাজ

মশাইয়ের জন্যে সে শতমূলী আনতে পাঠক-দেউলের জঙ্গলে রওনা হবে, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

সুমন্তদা বললে, 'জানিস তো কবিরাজ মশায়ের দশা। বুড়ো হয়ে গেছেন, ভালো করে চলতে-ফিরতে পারেন না। যে ছেলেটা ওঁর কাজ-কর্ম করে সেও গাছ-গাছালি চেনে না। বললেন, ওষুধ তৈরি করতে হবে, কাকে দিয়ে যে আনাই! আমি বললুম আমি চিনি—এনে দেব। কবিরাজ মশাই বলে দিলেন, পাঠকদেউলের জঙ্গলে পাওয়া যাবে।'

'আপনি চেনেন শতমূলী?'

'শতমূলী, অনন্তমূলী—সব চিনি।'

'কী করে চিনলেন?'

'আমাদের গ্রাম—জানিস না?'—বলতে বলতে চোখ গর্বে ভরে উঠল সুমন্তদার: 'কবিরাজী নিদান যিনি লিখে গেছেন—সেই মাধব করের গ্রাম। কত পণ্ডিত, কত কবিরাজের জায়গা। কী করেই বা জানবি? দেশে তা কখনো যাস নি।'

'না'।

'গেলে বুঝতে পারতিস। ওই যে গান আছে না? "ধনধান্যে পুষ্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা"—ওই গানটা যে কত সত্যি দেশে গেলে তা দেখতে পেতিস।'

ওই একটা কথা সুমন্তদা কখনো ভুলতে পারে না। 'বরিশাল! তার মতো কি আর দেশ আছে রে? "নাম বরিশাল—পুণ্যে বিশাল"—বুঝলি? অশ্বিনীকুমারের দেশ। বরিশালের মাটিতেই তো মুকুন্দদাসের গান। কালীশ পণ্ডিত মশাইয়ের কথা শুনেছিস কখনো? শুনেছিস জগদীশ মুখুজ্জের নাম? আর কী নদী, কত জল, কত নারকেল-সুপুরী—আর ধান! বরিশালের আর একটা নাম কী। জানিস? গ্র্যানারী অব্‌ বেঙ্গল। মানে জানিস? বাংলা দেশের শস্যভাণ্ডার।'

কিন্তু এ-সব কথায় বরিশাল সম্পর্কে আমার রোমাঞ্চ জাগে না

সে দেশ আমি দেখি নি, কখনো দেখব কি না তা-ও জানি না। আমার কাছে আত্রাই, বাড়ির সামনের কদম গাছ, মাঠের পাশে বকুলের সার, বাড়ির বাগানের ফুলেরা—যেখান থেকে কাঁঠালী চাঁপার গন্ধ, আমের বাগান, আখের ক্ষেত, বারোয়ারী চণ্ডীমণ্ডপের পাশে বোধনের বেলগাছ, ওই প্রকাণ্ড বটের গাছটা—অসংখ্য ঝুরি নেমেছে যা থেকে—দিনের বেলাতেই যেখানে কালো কালো ছায়া আর মধ্যে মধ্যে পড়ে পীরের শীর্ণি—এই সবের মধ্যেই ডুবে থাকে আমার মন। আর ওই পথটা—যে পথে আমি কোনোদিন যাই নি—সেই বালুর-ঘাটের রাস্তাটাই আমার শেষ স্বপ্ন।

আজ সেই অচেনা পথটা ধরেই চলেছি সুমন্তদার সঙ্গে। আমার চোখ ঘুরছিল ছ'পাশে। একটা গোরুর পিঠে চেপে ফিঙে লাফাচ্ছে, তাই দেখলুম; ছুটো ডাহুক টিপ টিপ করে দৌড়ে গেল জলার দিকে, তা চোখে পড়ল; এক জায়গায় ছোট্ট একটা গাছের নিচে লালে লাল হয়ে গেছে—সেই পোকাগুলো—এক সঙ্গে চাপ বেঁধে থাকে—দূর থেকে জমাট রক্তের মতো দেখায়।

আমি সজাগ হলুম সুমন্তদার গানে।

"এমন শুভ্র নদী কাহার—
কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়,
কোথায় এমন হরিৎ ক্ষেত্র—"

গানের মধ্যে বাধা দিয়ে বললুম, 'বরিশালে অনেক পাহাড় আছে, না সুমন্তদা?'

'দূর বোকা কোথাকার!'

'তবে যে আপনি বললেন, এটা বরিশালের গান?'

'মোটেই না। স্বদেশের গান। না—এসব বোঝানো যাবে না তোকে। এখন বিরক্ত করিস নি, গাইতে দে গানটা।'

সুমন্তদা আবার ধরল: 'কোথায় এমন হরিৎ ক্ষেত্র আকাশতলে মেশে—'

গোরুর গাড়ি করে লাল শাড়িপরা কাদের বউ যাচ্ছিল, একবার

ঘোমটা সরিয়ে দেখে নিল সুমন্তদাকে, আমি তার নাকে রূপোর নথ দেখতে পেলুম একটা। একজন পাগড়ী মাথায় খালি গা মানুষ রোদ্দুরে কালো চিকচিকে পিঠটা মেলে দিয়ে—ঘোড়ার জন্যে জোলো ঘাস কেটে কেটে আঁটি বাঁধছিল—সে অবাক হয়ে আমাদের দিকে চেয়ে রইল—আমি তাকে চিনতে পারলুম, সে বাণেশ্বর, আমাদের ঘোড়াকে ঘাস দিয়ে আসে। আমার ইচ্ছে ছিল তাকে একবার নাম ধরে ডেকে উঠি, কিন্তু সুমন্তদার গান নষ্ট হবে বলে ডাকা গেল না।

আমি পথের পাশ থেকে গোটাকয়েক ভেরেণ্ডার ফল ছিঁড়ে নিয়ে, তার কষ্‌টে গন্ধে খুশি হয়ে, খোলা ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে 'সায়েবের বাচ্চা'—অর্থাৎ শাদা শাদা পোকার মতো বিচিগুলো বের করতে লাগলুম।

'আমার এই দেশেতেই জন্ম, যেন এই দেশেতেই মরি—' গান শেষ করে সুমন্তদা বললে, 'মণ্টু!'

'উঁ?'

'দেশকে কখনো ভুলিস নি।'

'সায়েবের বাচ্চাগুলোকে পর্যবেক্ষণ করতে করতে আমি সরল বিশ্বাসে বললুম, 'না—ভুলব না।'

'সর্বদা মনে রাখবি, বিবেকানন্দ বলেছেন—'

আর বিবেকানন্দ! আমি তখন দাঁড়িয়ে গেছি পথের ধারে জলের দিকে তাকিয়ে।

'কী হল? থামলি যে?'

আমি বললুম, 'সুমন্তদা—জলের ভিতরে চ্যাং মাছ।'

সুমন্তদা হেসে ফেলল।

'তোকে কিছু বলাই বিড়ম্বনা। বলছি স্বামীজীর কথা, তোর নজর গেল চ্যাং মাছের দিকে!'

মাথা চুলকে বললুম, 'কী করব, লাফিয়ে উঠল যে!'

'তাই তো—চ্যাং মাছ লাফিয়ে উঠলে আর কী করবি! তখন কি আর দেশের কথা মনে থাকে কারুর!'

আমার দোষ ছিল না। কালো জলের ভেতরে ছোট ছোট বেগুনে ফুল ফুটেছে। আর তাদের তলায় সাঁতরে বেড়াচ্ছে এক ঝাঁক চ্যাং—অর্থাৎ ল্যাটা মাছের ছানা!

'সুমন্তদা, কয়েকটা মাছ ধরলে হয় না?'

'হুঁ, বাড়িতে তো মাছ জোটে না তোমার। এখন জলে নেমে, পাঁক ঘেঁটে—গোটা চারেক চ্যাংয়ের বাচ্চা ঘরে নিয়ে যাই, আর খুড়িমা তোকে আমাকে দুজনকেই তেড়ে আসুন। চল্‌চল্—অনেকটা যেতে হবে এখনো।'

সুমন্তদা কবিরাজমশাইয়ের জন্যে শতমূলী আনতে যাচ্ছেন, চলতে চলতে ভাবছেন পুণ্যে বিশাল বরিশালের কথা—দেশের কথা—স্বামীজীর কথা। কিন্তু আমার তো তা নয়। আজ এক অচেনা পথে, অচেনা আকাশে আমার ছুটি। চেনা বকগুলোকে নতুন ঠেকছে, আত্রাইয়ের ধারে যে মাছরাঙাদের দেখি এরা যেন তারা নয়, মস্ত পাকুড়গাছটার নীচে বসে যে তিনজন লোক হুঁকো টানছিল, তারা যেন আর এক জগতের মানুষ।

'সুমন্তদা, আমার ভীষণ ভালো লাগছে।'

'হঠাৎ?'

'বা-রে, কত দূর হেঁটে এলুম।'

'কত দূরই বটে। পুরো এক মাইলও হয় নি'—সুমন্তদা হাসল।

কিন্তু আমার কাছে এই এক মাইলই কি কম? দূর-দূরান্ত।' বললুম, 'সুমন্তদা, বালুরঘাট কত দূরে?'

'এইভাবে হেঁটে হেঁটে সেখানে যাওয়ারও ইচ্ছে আছে নাকি? সেও কাছেই, মাইল চল্লিশেক হবে বোধ হয়।'

তা হোক, বালুরঘাটে না গেলেও আমার চলবে। আমি যাই দেখি, তাতেই আমার চোখ ভরে যায়। এমন করে—এত দূরে হাঁটতে হাঁটতে আমি কখনো আসি নি।

'পা ব্যথা করছে নাকি রে?'

'না—না'।

একটা গ্রাম দেখা দিল। চোখে ঠুলি পরে ঘানি গাছে পাক খাচ্ছে কলুর বলদ। হাওয়ায় তেল আর খোলের গন্ধ। কিন্তু আমার চোখ পড়ল সামনের আর একটি দোকানে। সেখানে গরম গরম বোঁদে ভেজে—মস্ত কালো কড়াই ভর্তি রসের ভেতরে ছ্যাক ছ্যাক করে ঢেলে দিচ্ছিল। আবার দাঁড়িয়ে পড়লুম আমি।

'কি রে, দাঁড়ালি কেন? চলতে পারছিস না আর? তখনই তো বারণ করেছিলুম।'

'না, হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছে না। আমি বলছিলুম গরম বোঁদে ভাজছে।'

সুমন্তদা হাসল: 'সে তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু তাতে তোর কী? চল্।'

আমি তেমনি দাঁড়িয়েই রইলুম। উদ্দেশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট।

'খেতে হবে গরম বোঁদে? কিন্তু রাস্তায় এ-সব যা খুশি খেয়ে অসুখ করলে কে কৈফিয়ৎ দেবে খুড়িমাকে?

'না, অসুখ করবে না।'

গরম বোঁদে কিনতে হল সুমন্তদাকে। আমি যে একাই খেলুম, তাও নয়।

বোঁদে খাওয়ার লোভটাই বড়ো কথা নয়, এ-রকম লোভ আমার ছিলও না। আসলে দিনটাই আজ আলাদা। যে পথটা চিরদিন আমার স্বপ্নে মিশে কোন্ অজানা অদেখা বালুরঘাটের দিকে হারিয়ে গেছে, যে পথটার রাঙা ধুলো, গোরুর গাড়ি, লণ্ঠনের আলো, তালের সার, সাঁওতালের মাদল আমার রূপকথা—সেই পথে চলবার খুশিতে আমি তার সব কিছু দু' হাত ভরে কেড়ে নিতে চাইছিলুম। রাস্তার ধারে জলার ভেতরে চ্যাং মাছের ছানাপোনাগুলো একেবারে নতুন ঠেকছিল, এ-রকম বোঁদের গন্ধ আমি বুঝি আর কোনোদিন পাই নি। যে টাটকা পদ্মপাতাতে আমাদের বোঁদে খেতে দিল, সেই পাতার গন্ধটাও বোঁদের সঙ্গে মিশে আর একটা নতুন স্বাদ নিয়ে এল মুখে।

'খাওয়া তো হল চল এবারে।'

আরো আধ মাইল গোরুর গাড়ির রাস্তায় হেঁটে, একটা মাঠের আল দিয়ে যেতে যেতে কন্টিকারীর খোঁচা খেয়ে আর সুমন্তদার কাপড়ে বিস্তর চোরকাঁটা বিঁধলে, আমরা পৌঁছলুম পাঠক দেউলের জঙ্গলে।

জঙ্গল এখন আর এমন কিছু নয়। অনেকগুলো ঝুপসী গাছপালা জড়াজড়ি করে আছে, ঘন ছায়ায় ঢেকে আছে চারদিক। তা ছাড়া অজস্র ঝোপ ঝাড়। নানা রকমের পাখি ডাকছিল। একটা কয়েৎবেলের গাছ থেকে এক রাশ ফল ছড়িয়ে ছিল মাটিতে।

আর একটা মন্দির।

মস্ত বড়ো অশথের গাছ উঠেছে পাকে পাকে তাকে জড়িয়ে। ছড়িয়ে আছে কোথাও স্যাওলা ধরা—কোথাও ঝোপেঝাড়ে ঢাকা ইটের পাঁজা। পড়ে আছে ক'টা বড়ো বড়ো পাথর।

মন্দিরের দরজা বলে কিছু নেই—হাঁ-হাঁ করছে যেন খানিক কালো অন্ধকার। সেই অন্ধকারের সামনে দাঁড়িয়ে সুমন্তদা বললে, 'আগে প্রণাম করে নে মা-কে। সাধকের কালী, বুঝলি?'

প্রথমটা আমি কিছু দেখতে পেলুম না। তারপর চোখ সয়ে এলে অন্ধকারের ভেতরে চোখে পড়ল বিরাট এক আধভাঙা কালীমূর্তি। হাতগুলো ভাঙা। কিন্তু মাথা মুখ যেটুকু দেখতে পেলুম, তাতেই অন্তরাত্মা চমকে উঠল আমার। এমন ভয়ঙ্কর কালীমূর্তি এর আগে আমি কোনোদিন দেখি নি।

মন্দিরের ভাঙা বারান্দায় মাথা ঠেকিয়ে সুমন্তদা বললে, 'প্রণাম কর্—প্রণাম কর্।'

ভয়ে ভয়ে প্রণাম করে আমি সরে দাঁড়ালুম।

সুমন্তদা বললে, 'আয় এখানে, বোস এই পাথরটার ওপর। অনেকটা হাঁটা হয়েছে, জিরিয়ে নে একটু।'

দু'জনে বসলুম একটা বড়ো পাথরে। চারদিকে বড়ো বড়ো ঝুপসী গাছের ঘন ছায়া। পায়ের তলায় ভিজে ভিজে কালো মাটি,

এখানে-ওখানে শ্যাওলার ছোপ। একটা অদ্ভুত স্যাঁৎসেঁতে বুনো গন্ধ। পাখিদের একটানা কিচির মিচির। গাছ-পাতার ফাঁকে ফাঁকে মন্দিরের গায়ে রোদের জাফরি-কাটা।

একটু চুপ করে থেকে সুমন্তদা বললে, 'এই মন্দির কে তৈরি করেছিল জানিস? ভবানী পাঠক।'

সে বয়েসে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী-চৌধুরাণী' আমার কাছ থেকে অনেক দূরে। আমি বললুম, 'কে ভবানী পাঠক?'

'ডাকাতের সর্দার। কিন্তু মস্ত বড়ো কালী সাধক ছিলেন। নিজের জন্যে ডাকাতি করতেন না, অত্যাচারী বড়ো লোকদের টাকা-পয়সা কেড়ে এনে গরিবদের মধ্যে দান করে দিতেন। আর—'

'আর।'

'সব পাষণ্ড লোকদের ধরে এনে মায়ের পায়ে নরবলি দিতেন। ওই যে ওখানে একটা উঁচু মতন জায়গা দেখছিস, যেখানে বুনো ওলের জঙ্গল উঠেছে, বলি দিয়ে তাদের রক্ত ওখানে ছিটিয়ে দেওয়া হত। এখান থেকে দেখতে পাচ্ছিস না, মন্দিরের পেছনে মজা ডোবা রয়েছে একটা। আগে ওটা ছিল গভীর পুকুর। ওর পাঁকের তলায় ঘাঁটলে যে কত নরমুণ্ড আর নরকঙ্কাল বেরিয়ে আসবে—'

বলতে বলতে কেমন ফিসফিস করছিল সুমন্তদার গলা, গাছের পাতায় পাতায় শিরশিরানি জাগছিল, আর ভয়ে ছমছম করছিল আমার শরীর। আমি মন্দিরের সেই অন্ধকার গহ্বরটার দিকে তাকালুম কবার। ভেতরে মূর্তিটা দেখা যায় না—একটা কালো ছায়ার আভাস পাওয়া যায়—তারি মধ্যে মনে হল দুটো ভয়ঙ্কর চোখ যেন ধক্‌ধক্ করে জ্বলছে ওখানে।

'সুমন্তদা, এ-সব বোলো না।'

'কেন রে, ভয় করছে? আরে সে সব তো কতকাল আগেকার কথা। তা ছাড়া আমরা তো মায়ের সেবক, বীরব্রত

আমাদের—মা তো আমাদের রক্ষা করেন রে।'—বলেই সুমন্তদা গান ধরল ঃ

'চণ্ড মুণ্ড খণ্ড খণ্ড
মহিষাসুর ছিন্নতুণ্ড—'

কিন্তু আমার ভরসা হচ্ছিল না। চোখের সামনে যেন নরবলির রক্ত দেখতে পাচ্ছিলুম আমি।

বললুম, 'সুমন্তদা, এ-সব তোমায় কে বললে ?'

'এতো এদিককার সবাই জানে।'

'মা কালীর পুজো হয় না ?'

'ভাঙা মূর্তির পূজো করতে নেই—শাস্ত্রে নিষেধ আছে।'

'কে ভাঙল মূর্তি ?'

'কে জানে—কালাপাহাড়-টাহাড় হবে বোধ হয়। ভারী পাষণ্ড লোক ছিল সে।'

বড়ো হয়ে জেনেছিলুম, সুমন্তদা ভুল বলেছিল। ভবানী পাঠকের জন্মের বহু—বহু বহু দিন আগেই কালাপাহাড়ের হাড় ধূলো হয়ে গেছে কবরের তলায়।

'নতুন মূর্তি গড়লে পূজো করা যায় অবশ্য—' নিজে-নিজেই আবার বলল সুমন্তদা।

'করে না কেন নতুন মূর্তি ?'—আমি জানতে চাইলুম।

'বাপ্‌রে—সে বিষম ব্যাপার—' সুমন্তদা যেন ভয় পেয়ে গেল ঃ 'সিদ্ধ সাধকের প্রতিষ্ঠা করা মূর্তি—কার সাধ্য সে মুর্তি সরায় ওখান থেকে ? একবার এক জমিদার হাতী এনে, শেকল বেঁধে মূর্তি তুলতে চেয়েছিল, নড়ল না। বরং রাত্রে জমিদার স্বপ্ন দেখল—মা এসে তাকে বলছেন, খবর্দার, ও-সব চেষ্টাই করিস্ নি। আমি যেমন আছি আমাকে তেমনিই থাকতে দে। আর যদি বেশি বিরক্ত করিস, তা হলে দু'দিনের মধ্যে তুই তো মরবিই, তোর বংশে বাতি দিতে কেউ থাকবে না। ব্যস্—তারপর থেকে কেউ আর নতুন মূর্তি গড়িয়ে পূজো করার কথা ভাবেই না।'

আবার আমার গা ছমছম করে উঠল। মন্দিরের ভেতর থেকে কী যেন আওয়াজ উঠল একটা—আমি দারুণ চমকে গিয়ে জড়িয়ে ধরলুম সুমন্তদাকে।

'দূর বোকা, ভয় পাচ্ছিস কেন? অনেকগুলো চামচিকে রয়েছে ভেতরে, সেইগুলো ঝটাপটি করছে।'

'আমার ভালো লাগছে না সুমন্তদা, শতমূলী তুলবে না?'

'হাঁ, ঠিক ঠিক। তুই একটু বোস এখানে, ওদিকে আছে—আমি তুলে আনি।'

'আমি একা বসতে পারব না।'

'মণ্টু—ছিঃ!'

'আমি পারব না, সুমন্তদা।'

'মায়ের সেবককে এত ভয় পেলে চলে? তাকে সাহসী হতে হয়, বীর হতে হয়।'

'পরে হবে সুমন্তদা। কিন্তু এখন এখানে কিছুতেই একা বসতে পারব না আমি।'

'না মণ্টু এ-ভাবে চলবে না।'—সুমন্তদার স্বর গম্ভীর হল: 'এই তো সময়, এখন থেকেই তো চরিত্রকে তৈরি করতে হয়। তোর বয়েসে আমি একলা শ্মশানে যেতুম।'

'আমিও যাব।—আকুল হয়ে বললুম 'কিন্তু আজ নয়। আজ আমি কিছুতেই একা এখানে বসতে পারব না।'

সুমন্তদা হাসল: 'আচ্ছা, তবে আয় আমার সঙ্গে।'

মন্দির ছেড়ে একটু এগিয়ে গেলুম দু'জনে। এলোমেলো ঝোপঝাড়ের মধ্যে কী সব খুঁজে পেতে দেখতে লাগল সুমন্তদা, তারপরে সঙ্গের ঝোলাটা থেকে একটা খুর্‌পি বের করে ছোট ছোট ক'টা গাছ তুলে থলেয় পুরল।

'এবার যাওয়া যাক—বুঝলি? অনেকটা পথ ফিরে যেতে হবে আবার, ঢের বেলা হয়ে যাবে।'

যাওয়ার জন্যে আমি এক পায়ে খাড়া। পাঠক দেউলের বনে

এই আদ্যিকালের ক'টা গাছ, ওই ভাঙা মন্দির, হাতভাঙা বিকট মূর্তিটা, চারদিকে ছায়া, এই সব নরবলির গল্প—আমার শরীর মন ঝিমঝিম করছিল একেবারে। হাওয়ায় একটা পাতা নড়লেও রক্ত চলকে যাচ্ছিল মাথায়! এখান থেকে এখন বেরুতে পারলে আমি বাঁচি।

'সুমন্তদা—আপনি আগেও এখানে এসেছেন, না?'

'হুঁ—দু'বার।'

'শতমূলী তুলতে?'

'না। দেখতে। আমি যেখানে থাকি, তার চারদিক তন্ন তন্ন করে না দেখলে আমার ভালো লাগে না। পাঠক দেউলের নাম শুনে আমি দেখতে এসেছিলুম। আর এসে কী মনে হল জানিস?'

কথা বলতে বলতে চলেছিলুম আমরা। কী মনে হল, জানবার জন্যে ওর মুখের দিকে চাইলুম আমি।

'মনে হল, একটা চমৎকার জায়গা পেয়েছি।'

'চমৎকার জায়গা!'

নিশ্চয়ই। সিদ্ধ সাধকের পীঠ—জাগ্রত দেবতা। তুই যদি কাউকে না বলিস, তা হলে একটা কথা বলব তোকে।'

'বলব না কাউকে—' সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নাড়লুম আমি।

'উহুঁ, মুখের কথায় হবে না, দিব্যি করতে হবে।'

'মা কালীর দিব্যি—কাউকে বলব না।'

'মায়ের নামে দিব্যি করলি, মনে থাকে যেন—' সুমন্তদার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল: 'দিব্যি ভাঙলে জাগ্রতা মা ভীষণ রাগ করবেন তোর ওপর।'

সেই অন্ধকার গহ্বরের ভেতরে ভয়ঙ্কর মূর্তিটা, হঠাৎ যেন জ্বলজ্বল করে ওঠা দুটো চোখ—আমার হাত-পা হিম হয়ে যেতে চাইল। বললুম, 'না—না, কখনো দিব্যি ভাঙব না।'

'আমি কি ঠিক করেছি—জানিস? অমাবস্যার রাত্রে যখন কেউ

জানবে না, খুড়িমা না, কাকামণি না—তখন একা চলে আসব এখানে।'

'সে কি !'—নিজের কানকে আমি বিশ্বাস করতে পারলুম না।

'ওই তো সময়। অমাবস্যার মাঝ রাত্রেই মা-কে ধ্যান করবার সবচেয়ে ভালো সময়। আর এই সাধকের মন্দিরে—এই বনের ভেতর—এর চাইতে সুযোগ আর কী আছে ?'

কয়েক সেকেণ্ড কথা খুঁজে পেলুম না আমি।

'তোমার ভয় করবে না ?'

'না।'

'আমি হলে তো মরেই যাব।'

'মরবি কেন ? বুকে যার শক্তি, মুখে যার মায়ের নাম, তার কিসের ভয় ? স্বামীজী কী বলেছেন ?

"Who dares misery love,
And hug the form of Death,
Dance in Destruction's dance
To him the Mother
comes—"

ইংরিজিটা তখন ভালো বুঝতে পারি নি—ছাড়া-ছাড়া শব্দগুলো বড়ো হলে কুড়িয়ে নিয়ে মূল লাইনগুলোকে আবিষ্কার করেছি। কিন্তু সেই মুহূর্তে আমি হাঁ করে চেয়ে রইলুম সুমন্তদার মুখের দিকে।

'বলা যায় না—কিছুই বলা যায় না—' সুমন্তদা অন্যমনস্ক হয়ে গেল। 'কবে যে আমার ডাক আসবে সে তো কিছুই বলতে পারি না। তার আগে আমায় তৈরি হতে হবে। একদিন সব ফেলে চলে যাব হয়তো—কাউকে কিচ্ছু বলব না—এই মন্দিরে এখানে—মায়ের পায়ে পড়ে থাকব।'

'একা ?'

'একা।'

'কী খাবে এখানে?'

'সকলকে যিনি খেতে দেন, সে ভাবনা তিনিই ভাববেন।'

আমি কী বলতে যাচ্ছিলুম, তার আগেই হঠাৎ সুমন্তদা একটা হাত টেনে ধরল আমার।

'দাঁড়া—একটুও নড়িস নি।'

অদ্ভুত স্বর, অদ্ভুত ভঙ্গি। কিন্তু আমিও দেখেছি তখন। 'নড়িসনি' বলবারও দরকার ছিল না, এম্‌নিতেই আমি পাথর হয়ে গেছি।

ঠিক হাত তিনেক দূরে। এক রাশ শ্যাওলাধরা ভাঙা ইটের মধ্য থেকে মাথা তুলেছে সে। ছাই রঙের এক বিরাট গোখরো—বয়স্ক মানুষের ছড়ানো হাতের পাতার মতো ফণা, লিকলিক করে উঠছে জিভ, একটা রোদের ঝিলিক লেগে চকচক করছে গলার শাদা আঁশগুলো। অত বড়ো প্রকাণ্ড গোখরোকে সাপুড়েদের ঝাঁপি থেকেও আমি বেরুতে দেখি নি কখনো।

ডাইনে বাঁয়ে অল্প অল্প দুলছে ফণাটা। চাপা হিস্‌হিস্ শব্দ করছে। আর সেই নিষ্ঠুর কুটিল চোখ দুটো। স্থিরভাবে চেয়ে আছে আমাদের দিকে।

'নড়িস নি—একটুও না।'—সুমন্তদা যেন বাতাসে স্বর মিলিয়ে দিলে, ঠোঁট দুটো কাঁপল কি কাঁপল না: 'চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক—আপনিই সরে যাবে।'

গেলও, কিন্তু প্রায় মিনিট পাঁচেক পরে। কিন্তু আমার হৃৎপিণ্ড ততক্ষণে প্রায় থমকে পড়েছে। পা বেয়ে যে ঘামের ফোঁটা মাটিতে গড়িয়ে পড়ছে, তাও আমি টের পাচ্ছিলুম তখন।

ধীরে ধীরে ফণা নামিয়ে বিশাল সাপটা সর সর করে চলে যেতে লাগল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত দূরে শুকনো পাতার ভেতরে আমরা তার যাওয়ার শব্দ শুনতে পেলুম।

'চলে গেছে, চল্ এবার।'

কিন্তু আমি তখন ধপ করে বসে পড়েছি মাটিতে।

সুমন্তদা দু' হাতে তুলে নিলে আমাকে। একেবারে কাঁধের ওপর।

ক্ষীণ স্বরে বললুম, নামিয়ে দাও—নামিয়ে দাও আমাকে। আমি যেতে পারব।'

'দেব নামিয়ে। এই বনটা পার করে।'

আমার আর প্রতিবাদ করবার শক্তি নেই তখন। দু হাতে সুমন্তদার গলা জড়িয়ে ধরে চোখ বুজে রইলুম আমি।

'ভয় কি রে!'—সান্ত্বনার কোমল গলায় সুমন্তদা বলতে লাগল: 'কিসের ভয়? ওতো বাবার সাপ। মা যেখানে থাকেন, বাবাও সেখানে থাকেন। মা-র ভক্তদের কি কখনো বাবার সাপ কিছু বলতে পারে?'

যে বাবা, তাঁর সাপ কেন এত নিরীহ এ সব ভাববার মতো আমার অবস্থা নয় তখন। আমি কেবল কাতরভাবে বললুম 'সুমন্তদা —এর পরেও আর এখানে আসবেন আপনি?'

'কেন আসব না রে? অমাবস্যার রাত্রে একা আলো না নিয়ে চলে আসব, বাবার সাপ এমনিতেই আমার পথ ছেড়ে দেবে।' বিহ্বল মন নিয়ে আমি শুনতে লাগলুম সুমন্তদা গান ধরেছে:

'অভয় পদে ঠাঁই পেয়েছি যে মা—
কোন্ ভয় আর মিছে ভয় দেখাবে?
মরণময়ীর শরণ নিয়েছি মা—
মরণ আমায় কোথায় খুঁজে পাবে?"

॥ চার ॥

স্মৃতির ছবিগুলো ছিঁড়ে গেল হঠাৎ। সমুদ্রের হাওয়ায় গানের সুর।

চোখ মেলে তাকালাম। জেলে-নৌকোর বহর আসছে কূলের দিকে। কোন্ ভোরে মাছ ধরতে গিয়েছিল দূরের সমুদ্রে, ফিরে আসছে এখন।

কালো কালো লম্বা নৌকোগুলো ঢেউয়ে ঢেউয়ে দুলছে। মাথায় টুপি পরা নিকষ কালো গাঁয়ের মানুষ একদল। তারাই গান গাইছে। গানের শব্দগুলো ঠিক শোনা যায় না—শুনলেও বুঝতে পারতুম না। সমুদ্র আজ খুশি হয়ে দু' হাত ভরে দিয়েছে, তার গান? নিরাপদে আজও বাড়ী ফিরে আসছি আমরা তার গান? কিংবা কোনো জেলের মেয়ের কালো চোখ সাগরের দিকে কার আশায় আকুল হয়ে চেয়ে আছে—সেই গান?

সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আত্রাইয়ের নীল জল আবার ফিরে এল—এই সাগরে যে জলের কণা মিশে আছে; কালো কালো জেলে-নৌকোগুলো মিশে যাচ্ছে বন্দরের মহাজনী নৌকোর সঙ্গে। নৌকো থেকে কে যেন জলে ছিপ ফেলেছিল, রোদে চকচক করতে করতে একটা বোয়াল মাছ উঠে এল—

'মণ্টু!'

মা ডাকছেন। আমার কাঁধে গামছা, দীপুর হাতে ছোট একটা ঘটি।

সুমন্তকে সঙ্গে না নিয়ে নদীর ঘাটে যেয়ো না।'

'না মা, জলে নামব না আমি।'

'তবু দাঁড়িয়ে যাও। সুমন্ত গঞ্জে গেছে, আসবে এক্ষুণি!'

'বলছি তো মা, জলে নামব না। ঘাটে বসে, ঘটি দিয়ে জল ঢালব মাথায়।'

'বিশ্বাস নেই তোর কথায়। নদীতে এখন ভরা জল। রামধারী সঙ্গে যা।'

রামধারী বাড়ির চাকর। আদেশ পাওয়া মাত্র দাঁতন করতে করতে রওনা হল সঙ্গে।

খিড়কী দরজা থেকে একটু এগিয়েই আত্রাই। টলমল করছে নীল জল। বড়ো হয়ে ভারতবর্ষের কত নদীই তো চোখে পড়ল, কিন্তু আত্রাইয়ের মতো মিষ্টি নদী বুঝি কখনো দেখি নি। বর্ষায় যখন ঘোলা জল ফেনার ফুল নিয়ে ডাকতে ডাকতে ছুটে যায়—ডাঙা ছাপিয়ে প্রায় আমাদের ঘোড়ার আস্তাবল ছোঁয়-ছোঁয়, তখন তার এক মূর্তি। তখন কত শুশুক হুশ হুশ করে ডিগবাজী খেতে থাকে। শরতে একেবারে ভরা—মহাজনী নৌকোয় ছেয়ে যায় গঞ্জের ঘাট আর কী বড়ো বড়ো চিতল ধরা পড়ে জেলেদের জালে। শীতে শুকিয়ে এতটুকু—বালির ডাঙায় কাদাখোঁচা চরে বেড়ায়, তারপরেই দেখি কারা যেন অসংখ্য রাঙা প্রদীপ জ্বেলে দিয়েছে স্রোতে—শিমূলের ফুলগুলো আত্রাইয়ের জলে ভাসতে ভাসতে কোথা থেকে কোথায় চলে যায়!

গঞ্জের ঘাটে দেখি, ছেলে-বুড়োরা নদীর জল নিয়ে তোলপাড় করে; নৌকোর তলায় তলায় ডুব দিয়ে লুকোচুরি খেলে, সাঁতরে এপার থেকে ওপারে চলে যায়। আমরা ছোট, সাঁতার জানি না—আমাদের বেশির ভাগ দিনই স্নান চলে বাড়ির ইদারায়। শুধু যেদিন বাবা সঙ্গে আসেন, সেদিন অন্যরকম—আমরাও নদীতে আসি, জলে নামতে পাই, অজস্র চ্যালা মাছ এসে গায়ে কুটকুট করে ঠোকরায়—গামছা মেলে সেগুলোকে ধরি, আবার জলে ছেড়ে দিই। দীপু বাবার হাত ধরে টুপ টুপ করে ডুব দেয়, আমি যাতে দূরে না যাই—বাবা সেদিকে কড়া নজর রাখেন।

সুমন্তদা আসবার পরে সব অন্যরকম হয়ে গেছে। ইস্কুল

থাকলে অবশ্য হয় না, নইলে ছুটির দিনে নদীতে স্নান আমাদের বাঁধা। সুমন্তদার হাতে আমাদের ভার দিয়ে মা নিশ্চিন্ত।

আজ নদীতে যাওয়ার আগে যখন সুমন্তদা উঠোনের পেয়ারা গাছটার তলায় বসে খুব করে গায়ে তেল মাখছে তখন মা-র কী একটা জরুরী কাজ পড়ল।

গামছাটা কাঁধে ফেলে সুমন্তদা বললে, 'আমি এক ছুটে খুড়িমা যাব আর আসব।'

আমরা ভাই-বোনে রওনা হয়েছিলুম ঘাটের দিকে। মা বললেন, 'খবর্দার, সুমন্ত না আসা পর্যন্ত জলে নামবি না।'

আর রামধারী দাঁতন করতে করতে চলল আমাদের পাহারায়।

দু' ধারে খুঁটি গেড়ে, কয়েকটা কাঠ ফেলে ঘাট। আমরা দু'জনে ঘাটে নামলুম।

একটু ওপরে, বালির মধ্যে বসে, নিমের দাঁতন ঘষতে ঘষতে রামধারী বলল, 'দাদাবাবু, পানি মে উতার্‌বে না। মাইজী বোলে দিয়েসে।'

'হয়েছে, হয়েছে, তোকে আর মোক্তারী করতে হবে না।'

'সুমন্ত দাদা আসলে তখন উতার্‌বে।'

শুনে, রামধারীকে আমি ভেংচি কাটলুম।

রামধারী বললে, এখুন তো ভেংচি কাটো। ফের যখন ঘুড্‌ডি বানিয়ে দিতে হোবে, কি পাকা আম পাড়িয়ে দিতে বোলবে, তখুন দেখা যাবে।'

আমরা দু'জনে জলের মধ্যে পা মেলে দিয়ে বসে রইলুম, পায়ের পাতায় টুকটুক করে ঠোকর দিচ্ছিল চ্যালা মাছ—ভারী মজা লাগছিল। দীপু তার ছোট ঘটিটা দিয়ে এক এক বার জল তুলে মাথায় ঢালছিল।

আমার বিরক্তি ধরে গেল। ওদিকে গঞ্জের ঘাটে আমার বয়সী ছেলের দল নদী তোলপাড় করছে—নৌকোয় উঠে জলের ভেতরে ঝাঁপিয়ে পড়ছে কেউ-কেউ। হাসি-চিৎকারের আওয়াজ আসছিল

সমানে। আর থাকতে পারলুম না। টুপ করে নেমে পড়লুম জলে, তারপর ঘাটলা আঁকড়ে ধরে পা ছুঁড়তে লাগলুম।

রামধারীর বোধ হয় দেশোয়ালী জুটেছিল কেউ, ব্যাপারটা সে লক্ষ্য করে নি। কিন্তু দীপু চেঁচিয়ে উঠল সরু গলায়। 'ও রামধারী—দাদা, জলে নামল!'

রামধারী বললে, 'দাদাবাবু উঠো।'

কিন্তু রামধারীর কথায় কান দিলুম না আমি, চট করে একটা চড় লাগিয়ে দিলুম দীপুকে।

'দাদা জলে নামল। নামবই তো। রামধারীকে ভয় পাই নাকি আমি?'

চড়টা দীপুর হাতে লাগল, হাত থেকে ছিটকে পড়ল ঘটিটা। আর স্রোতের টানে সঙ্গে সঙ্গে অনেকখানি এগিয়ে গেল সেটা।

'দাদা, ঘটিটা চলে যাচ্ছে।'

তারপরে কী যে ঘটল, ঠিক বলতে পারি না। আমি তৎক্ষণাৎ ঘটি ধরতে গেলুম, হাতের ধাক্কায় আরো দূরে সরে গেল সেটা, আরো একটু এগিয়ে গেলুম আমি, আর—

আর পায়ের তলা থেকে সরে গেল মাটি, মাথার ওপর থেকে মুছে গেল আকাশ। আমি ডুবে গেলুম। প্রাণপণে ভেসে উঠতে চাইলুম, মাথা তুললুম কয়েকবার, আবার নেমে গেলুম জলের তলায়। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে—জল গিলছি—চোখ অন্ধকার হয়ে আসছে। একবার যেন মনে হল দীপু ডাকছে: 'দাদা—দাদা—', যেন রামধারী ঝাঁপিয়ে পড়ে আমায় ধরতে চাইছে, অথচ ধরতে পারল না। তারও দোষ নেই, সেও সাঁতার জানত না।

সব ভাবনা লুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল, তবু তার মধ্যে বুঝতে পারছিলুম, আমি ডুবে যাচ্ছি, মরে যাচ্ছি আমি। সেই আশ্চর্য সুন্দর—নীল, নীল নদী আত্রাই আমাকে তলিয়ে-ভাসিয়ে টেনে নিয়ে চলেছে, আমি আর কখনো মা-কে দেখতে পাব না, বাবাকে না, দীপুকে না—কাউকে না।

অথচ আত্রাই সেদিন আমাকে নিতে পারল না, নইলে আজ এতদিন পরে, কলকাতা থেকে এত দূরে নীলম রোডের এই বাংলোয় বসে—সমুদ্রের দিকে চোখ মেলে দিয়ে সুমন্তদার কথা আমি ভাবছি কী করে। সামনে থেকে ঢেউয়ের একটানা শব্দে—যার মধ্যে সেদিনের আত্রাইয়ের জলও মিশে আছে, আমি যেন একটা মৃদু ফিসফিসানি শুনতে পাচ্ছি : 'ছেলেবেলার সেই ঘুম-ঘুম দিনগুলোর ভেতর থেকে আমি তোমায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলুম, বেঁচে যেতে তা হলে। অনেক গ্লানি, অনেক দুঃখ, অনেক নিরুপায় যন্ত্রণা, অনেক হৃদয়ছেঁড়া আর্তির হাত থেকে মুক্তি পেতে তুমি, সোনালি রঙে দেখা জীবনটা তা হলে এমন করে কালো হয়ে যেত না।'

হ্যাঁ, সুমন্তদাই।

চেতনার শেষ স্ফুলিঙ্গটা নেববার আগেই জল থেকে টেনে তুলেছিল আমাকে। সেই সময় সে ঘাটে এসে পৌঁছেছিল।

পরদিন সুমন্তদা কথাটা পেশ করল বাবার কাছে।

'কাকামণি, মন্টুকে আমি সাঁতার শেখাব। বরিশালের ছেলে হয়ে ডুবে যাবে এইটুকু একটা নদীর জলে? মান-ইজ্জত থাকে আমাদের?'

মা অবশ্যই প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু বাবা বললেন, 'খুব ভালো কথা। শিখুক সাঁতার।'

'যা দুরন্ত—হঠাৎ যদি ভেসে-টেসে যায়—' মা-র গলা ধরে এল।

'আমি আছি কী করতে? আড়িয়াল খাঁ সাঁতরে এপার ওপার করেছি খুড়িমা, দু' ব্যাটা কুমিরের সঙ্গেও দেখা হয়ে গিয়েছিল। এ আবার নদী নাকি? এতো বাবুগঞ্জের খালের চেয়েও ছোট।'

আমাকে সাঁতার শিখিয়েছিল সুমন্তদা। স্রোতের জলে সাতটা দিনও লাগে নি। কিছু জল খেয়েছি, মাথা ডুবিয়ে হাত-পা ছুঁড়েছি দু' দিন, তারপর যখন জলের ওপর গলা তুলে হাঁসের মতো এগিয়ে চললুম, তখন নিজেকে মনে হল সম্রাটের মত। নদীর জল যতই

অথই হোক—এখন তার ওপর দিয়ে সম্রাটের মহিমায় আমি যেখানে খুশি, যতদূর খুশি চলে যেতে পারি।

সুমন্তদা বলেছিল, 'মণ্টু, বেঁচে থাকতে হবে। শক্ত হয়ে বীর হয়ে, বেঁচে থাকতে হবে আমাদের।'

এসব অনেকবার শুনেছি। বললুম, 'হুঁ।'

'হুঁ নয়। কাল থেকে আরো বেশি করে ডন-বৈঠ্কি দেওয়াব তোকে। তারপর আর একটু বড় হলে কাকামণির ওই শাদা আরবী ঘোড়াটায় চড়াতে শেখাব।'

শুনে দারুণ খুশি হলুম আমি।

আমাদের সহিস রামযশ বলে, 'বাবু যদি একটা ছোট ঘোড়া মাঙিয়ে দেন, তা হলে তুমি চড়তে পারো।'

'দূর—দূর, ওই সব খোঁড়া টাট্টু! ওগুলো কি আর ঘোড়া নাকি—রামছাগল বললেই হয়। বরিশালে আমরা কী করতুম, জানিস? ওই টাট্টুগুলো যখন মাঠে ছোলা কিংবা মটর শাক চিবুতে আসত, তখন ওগুলোর পিঠে চেপে শপাশপ চালাতুম খেজুরের ডাল। তাও কি নড়তে চায়? বেতো রুগীর দল যত।'

'সুমন্তদা, আমি বরিশাল যাব।'

'যেতে হবে বইকি। অশ্বিনীকুমারের দেশ। পুণ্যে বিশাল। গ্র্যানারি অব বেঙ্গল—' বলতে বলতে সুমন্তদা উদাস হয়ে গেল: 'কিন্তু কিছু করতে পারছি না। সেই বরিশালের ছেলে হয়েও। শুধু সময়ই চলে যাচ্ছে।'

'তুমি তো বলেছিলে, ডাক আসবে।'

'হুঁ।'—সুমন্তদার ভুরু কুঁচকে এল একবার: কিন্তু কবে যে আসবে! সব ছেড়ে দিয়ে তো বেরিয়েই পড়েছিলুম। কিন্তু কী যে হয়ে গেল! স্টিমারে ওই স্বপ্নটা যদি না দেখতুম—'

কিছুক্ষণ চুপ। সুমন্তদা উদাস চোখ মেলে চেয়ে রইল মাথার ওপরে কদম গাছটার দিকে। সেখানে কতগুলো শালিক আর বুলবুলি মিলে কিচির-মিচির জুড়ে দিয়েছিল।

'মণ্ট ?'

'অ্যাঁ ?'

'সামনের অমাবস্যায়।'

একটা কুটিল সন্দেহে ভরে গেল আমার মন।

'সামনের অমাবস্যায়—কী ?'

'সবাই ঘুমুলে আমি চলে যাব পাঠক দেউলে।'

'ওরে বাবা!'

সুমন্তদা বিরক্ত হল।

'এত করে তোকে বোঝালুম কী ? মায়ের মন্দির—সাধকের পীঠস্থান। দেখলি নে, বাবার সাপও ফণা তুলে কেমন সুড় সুড় করে সরে গেল, একটা কথাও বললে না।'

সাপ কখনো কথা বলে কি না, আমি জানি না। কিন্তু বললেও যে খুব মিষ্টি করে কিছু সে বলত, এ-রকম মনে হল না আমার। আমি বললুম, 'তা বটে, তা বটে। কিন্তু সুমন্তদা—'

'আবার কিন্তু কী ?'

'মা তো সব জায়গাতেই রয়েছেন। বাড়িতে বসেও তো তাঁর ধ্যান করা চলে।'

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল সুমন্তদা।

'হুঁ, কথা তো শিখেছিস দেখছি।'

আমার কৃতিত্ব ছিল না। ওটা সুমন্তদার সঙ্গগুণে।

সুমন্তদা বললে, 'ঠিক, মা সব জায়গাতেই রয়েছেন। তবে কী জানিস, স্থান-মাহাত্ম্য বলেও তো একটা ব্যাপার আছে। ঘরে বসে অনেক চেষ্টা করে মা-কে ডেকে আনতে হয়, কিন্তু মা ওখানে জেগেই বসে রয়েছেন, ভক্ত গিয়ে একটু মন দিয়ে ডাকতে পারলেই দেখা দেবেন।'

'কিন্তু সুমন্তদা, মা এত কষ্ট ক'রে ওই জঙ্গলের ভেতরে একটা বিচ্ছিরি ভাঙা মন্দিরে থাকেন কেন ? বন্দরেও তো নতুন কালীবাড়ি

রয়েছে, কত ভোগ দেয়, রোজ পূজো হয়, সেখানে এসে থাকলেই পারেন।'

সুমন্তদা একটু চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে, যেন কী বলবে ভেবে পেলো না। তারপর বললে, 'চুপ কর বোকা কোথাকার। এ-সব তুই বুঝতে পারবি না।'

'সুমন্তদা, তোমার কিন্তু ওখানে না যাওয়াই ভালো। বাবা যদি জানতে পারেন—'

চোখের দৃষ্টি সন্দিগ্ধ হল সুমন্তদার।

'কেন, তুই বলে দিবি নাকি?'

'না—না, আমি বলতে যাব কেন?'—আমি তটস্থ হলুম। সেদিন যে আমি সুমন্তদার সঙ্গে পাঠক দেউলের বনে চলে গিয়েছিলুম, সেটা জানলেও বাবা খুশি হতেন কি না তাতে প্রচুর সন্দেহ আছে আমার। তার ওপরে আবার সেই 'বাবার সাপ!' সুমন্তদার যত ভরসাই থাক, আমার বাবা একবার তা জানলে সুমন্তদার কপালে বকুনি তো নির্ঘাত, আমাকেও আর কখনো বেরুতে দেবেন না ওর সঙ্গে—সে সুমন্তদা আমাকে যতই সাঁতার শেখাক আর 'বীর বাণীই' শোনাক।

'মা কালীর নামে কী দিব্যি করেছিলি, মনে আছে?'

'মনে নেই আবার!'

সুমন্তদা বললে, 'কিছু ভাবিস নি। ক'দিন বাদেই তো অমাবস্যা। আমি চলে যাব ওখানে।'

'তারপর?'

তারপর সারারাত মন্দিরের চাতালে বসে ধ্যান করব।

'কিসের ধ্যান?'

'আঃ—জ্বালালি। কিসের ধ্যান আবার, মায়ের ধ্যান।'

'তোমার ভয় ধরবে না?'—ভাবতেই আমার রোমাঞ্চ হল: 'কত নরবলি দিয়েছে ওখানে। নিশ্চয় ভূত আছে।'

'ভূত তো থাকবেই, না থাকলে চলবে কেন? তারা সব বাবার অনুচর।'

'কী সর্বনাশ!'

'কার সর্বনাশ।—সুমন্তদা ব্যাজার হয়ে বললে, 'যারা ভীতু, যারা অকর্মা, ভূত তাদেরই ঘাড়ে চাপে। কিন্তু যারা মায়ের সেবক, ভূতেরা তাদের কখনো কিছু বলে না।'

'সুমন্তদা—ওরা যদি তোমাকে চিনতে না পারে? যদি হঠাৎ দাঁত খিঁচিয়ে—'

'থাম্—চুপ কর, গাধা কোথাকার। তোর সঙ্গে কথা বলাই ধাষ্টামো। সাহস থাকে তো চল্ আমার সঙ্গে। দেখবি, মায়ের নামে ভূত-প্রেত-বাঘ-ভালুক ত্রিসীমানাতেও ঘেঁষবে না কেউ।'

মায়ের নামের ওপর অতখানি ভরসা করতে পারলুম না আমি। চুপ করে রইলুম।

সুমন্তদা আবার বললে, 'খবরদার, কিছু বলবি নি কাউকে।'

'না—না।'

অমাবস্যা কবে সে খেয়াল আমার ছিল না। কারণ স্কুলে এক নতুন সেকেণ্ড মাস্টারমশাই এসেছেন। পাত্‌লা ছিপছিপে চেহারা হাসি-হাসি মুখ, দেখলেই মনে হবে এখুনি একটা মজার গল্প বলবেন। কিন্তু মজার গল্প তিনি বলেন না। পাটীগণিতের যত বেয়াড়া অঙ্ক তিনি করতে দেন এবং না পারলে—

'আহা বাছাধন—' প্রায় হাসতে হাসতেই বলেন, 'মাথায় ঢুকছে না বুঝি? জমাট বেঁধে গেছে মগজের ভেতর? তা বেশ বেশ, একবার এসো এদিকে, মগজটায় একটা নাড়াচাড়া দিয়ে দিই।'

নাড়া-চাড়া ভালোই দেন। বেতের কারবার করেন না, হাতই তাঁর যথেষ্ট। পটাপট চাঁটি মারেন মাথায়। রোগা রোগা লম্বা আঙুলে অত জোর যে কোথা থেকে পান, তিনিই জানেন, কিন্তু সে চাঁটি যে একবার খেলো আধঘণ্টা ভোঁ হয়ে বসে থাকতে হয় তাকে। পেটানোর জন্যে এতদিন হেড পণ্ডিতমশাইয়ের নাম ছিল, কিন্তু হাসি-হাসি মুখ সেকেণ্ড মাস্টার এক মাসেই তাঁর খ্যাতি তলিয়ে দিলেন।

সেই সেকেণ্ড মাস্টারের ভয়ে তটস্থ হয়ে প্রাণপণে অঙ্ক কষে যাই। কিন্তু অঙ্কে আমার মাথা নীরেট, আর প্রশ্নের অঙ্ক হলে তো চোখে অন্ধকার দেখি। সে দিন এই রকম কয়েকটা অঙ্কের সমস্যায় আমি বিব্রত ছিলুম। যদিও সেকেণ্ড মাস্টারের চাঁটি এখনো আমার মাথায় পড়ে নি, কিন্তু অঙ্কগুলো কষতে না পারলে আজ আর নিস্তার নেই।

সুমন্তদা বেশ টকাটক অঙ্ক কষতে পারে। অন্যদিন সাড়ে ছ'টা বাজতে না বাজতে সে মাদুর পেতে আমাদের পড়াতে বসে যায়, অথচ সাড়ে সাতটা বাজল এখনো তার দেখা নেই!

মা আমাদের সকালের খাবার মুড়ি, পাটালী গুড় আর নারকেল-কোরা নিয়ে এলেন। বললেন, 'সুমন্তর আজ কী হল? সেই কোন্ ভোরে উঠে ডন-বৈঠক দেয়, আজ এখনো উঠল না! শরীর-টরীর খারাপ হল নাকি? মণ্টু, দেখে আয় তো একবার।'

দীপু হেসে উঠল খিলখিল করে।

'জানো মা, সুমন্তদা হাঁ করে খুব ঘুমুচ্ছে। আর কুর-কুর করে আওয়াজ বেরুচ্ছে নাক দিয়ে।'

মা বললেন, 'তুই থাম, তোকে আর জ্যাঠামো করতে হবে না।'

হঠাৎ একটা কথা মনে হল আমার, আর সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ চমকে উঠল।

'মা, কী তিথি আজকে?"

'কেন, ভট্চার্যির মতো তিথির খবরে তোমার কী দরকার? কাল অমাবস্যার লুচি খেলি, মনে নেই? আজ প্রতিপদ।'

অমাবস্যা, পূর্ণিমা, একাদশীতে রাত্রে লুচি হতই, বাড়ির বাঁধা নিয়ম। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সব বুঝতে পারলুম আমি। কাল রাত্রে নিশ্চয় পাঠক দেউলে গিয়েছিল সুমন্তদা। স্বয়ং ডাকাতের সর্দার ভবানী পাঠক, কিংবা মা কালী, কিংবা বাবার ভূত-পেত্নী—কাদের সঙ্গে দেখা করে এসেছে, কে জানে!

আমি ছুটে চলে গেলুম সুমন্তদার ঘরে।

মশারির ভেতর চিৎ হয়ে পড়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে সুমন্তদা। দীপু ঠিকই বলেছিল। গুরু গুরু করে নাক ডাকছে সুমন্তদার।

'সুমন্তদা!'

সাড়া নেই। এবার গায়ে হাত দিয়ে ডাকলুম: 'ও সুমন্তদা!'

সুমন্তদা চমকে উঠল ভয়ানকভাবে। দুটো লাল টকটকে চোখ মেলে এমনভাবে আমার দিকে চাইল যে মনে হল সে আমাকে চিনতে পারছে না।

ভয় পেয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বললুম, 'সুমন্তদা, আমি মন্টু।'

জড়ানো গলায় বললে, 'ডাকছিস কেন?'

'বা-রে, কত বেলা হয়ে গেল যে। উঠবেন না? মা জলখাবার খেতে ডাকছেন।'

'খুড়িমাকে বলিস, কাল রাতে ভালো ঘুম হয় নি, জেগে কাটিয়েছি—তাই উঠতে একটু দেরী হবে আজ।'

'সুমন্তদা—' গলা আরো নামিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, 'কাল রাত্রে আপনি পাঠক দেউলে গিয়েছিলেন—না?'

সুমন্তদার টকটকে রাঙা চোখে অদ্ভুত আতঙ্ক ফুটে উঠল একটা। চুপ করে রইল কয়েক সেকেণ্ড।

'তোকে বলব বিকেলে, এখন নয়। কিন্তু তুই এ-সব কাউকে—'

'না—না, মা কালীর দিব্যি।'

সুমন্তদা পাশ ফিরতে ফিরতে বললে, 'তা হলে যা, আমি আর একটু ঘুমুই।'

মা-কে এসে বললুম, 'সুমন্তদার রাতে ঘুম হয় নি বলল। পরে উঠবে।'

'জ্বর-টর হয় নি তো?'

'না, আমি গায়ে হাত দিয়ে দেখেছি। একেবারে ঠাণ্ডা।'

নিশ্চিন্ত হয়ে মা রামধারীকে বকতে চলে গেলেন। সে ক'টা চায়ের পেয়ালা ভেঙে ফেলেছিল। কিন্তু এ-সব বকুনিতে রামধারীর

কিছু হয় না, সে তৎক্ষণাৎ বাড়ির বাইরে গিয়ে গান জুড়ে দেয়ঃ 'কাঁহা রহলে হো রামা—'

সেকেণ্ড মাস্টারের হাতে যে কী দশা হবে, সে তো বুঝতেই পারছি। প্রাণপণে যা পারি, তাই কষতে লাগলুম। কিন্তু সমস্ত মন আমার অন্য চিন্তার মধ্যে ডুবে রইল। দুটো রাঙা টকটকে চোখ সুমন্তদার। অদ্ভুত একটা ভয়ের ছায়া পড়েছে সেখানে।

কী দেখেছে সে? কী দেখেছে পাঠক দেউলের জঙ্গলে?

ইস্কুলে গিয়ে অবশ্য খোশ খবর মিলল একটা। সেকেণ্ড মাস্টার কী কাজে গেছেন বালুরঘাটে। আজ-কাল তিনি আসবেন না। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল আমাদের।

তাঁর জায়গায় ক্লাসে এলেন ড্রয়িং স্যার আলিম সাহেব। ভীষণ ভালো মানুষ, কাউকে বকেন না। তিনি এসে আমাদের অঙ্ক দিলেন না। 'ঈশ্বরের মহিমা' সম্পর্কে একটা বাংলা রচনা আমাদের লিখতে দিয়েই ঘুমিয়ে পড়লেন আর রচনার বদলে স্লেটের ওপর কাটাকাটি খেলা শুরু করলুম আমরা।

মনের ভেতরে ঘুরছে সুমন্তদা। কী দেখেছিল পাঠক দেউলের জঙ্গলে? কেন তার চোখ দুটো ওই রকম টকটকে লাল?

বিকেলে বাড়ি ফিরে দেখি, খাঁচার খরগোস দুটোকে ঘাস দিচ্ছে সুমন্তদা। আমার দিকে একবার আড়চোখে চেয়ে চাপা গলায় বললে, 'জলখাবার খেয়ে চল একবার নদীর ধারে। তোর সঙ্গে কথা আছে।'

বইপত্র রেখে, কোনো মতে হাত-পা ধুয়ে গোগ্রাসে গিলে নিলুম দুধ-রুটি। আজ ইস্কুলের মাঠে ফুটবল খেলার কথা ছিল, কিন্তু তার চাইতেও বড়ো প্রলোভন সামনে। নিশ্চয় জঙ্গলে গিয়ে ভয়ানক কিছু দেখেছে সুমন্তদা। ভূত-পেত্নী না দেখলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু ওই কালীমূর্তির দিকে চাইলেই তো প্রাণ চমকে ওঠে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে দেখি, সুমন্তদা বাইরের সেই কদম গাছটার তলায় পায়চারী করছে। আমাকে বললে, 'চল্।'

ফুটবল পেটানোর আওয়াজ আসছিল একটু দূর থেকে। কে যেন ডাকল—'মন্টু, এই মন্টু-উ-উ।' কিন্তু আমি কান দিলুম না সেদিকে। কালকে রাত্রের যে দুর্বোধ্য একটা রহস্য সুমন্তদাকে ঘিরে রয়েছে, তারই টানে চলতে লাগলুম ওর সঙ্গে।

বেলা পড়ে এসেছে। ওপারের গাছপালায় ঘন হয়ে আসছে ছায়া, রাঙা রোদ জ্বলছে আত্রাইয়ের নীল জলে, সেই রোদে সোনার ঝলকের মতো উলটে যাচ্ছে চিতল। চুনী-পান্নার রঙ দেখে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে মাছরাঙা। বাড়ির ঘাট থেকে খানিক এগিয়ে—গঞ্জের উলটো দিকের একটা আঘাটায় এসে পৌঁছুলুম দু' জনে। জেলে-নৌকো বাঁধা ছিল একটা, তার ওপরে নেমে বসলুম আমরা।

'সুমন্তদা, কী হয়েছে?'

জবাব দিল না। নদীর স্রোতে নৌকোটা তিরতির করে কাঁপছিল, হাওয়ায় চুলগুলো উড়ছিল সুমন্তদার। আমি দেখতে পেলুম—সুমন্তদার চোখের কোণে কালি, মুখ শুকনো—নিজের ভাবনার মধ্যে ডুবে রয়েছে সে।

'কী হয়েছিল সুমন্তদা?'

চমকে সুমন্তদা বললে, 'অ্যাঁ?'

আমার ভয় করতে লাগল। মনে হল নিশ্চয় কাল পাঠক দেউলের জঙ্গলে একটা ভয়ঙ্কর কিছু দেখেছে—হয়তো ভবানী পাঠক একদিন ওই মন্দিরে যাদের বলি দিয়েছিলেন—তারা দল বেঁধে উঠে এসেছিল সামনে, নইলে 'বাবা'র অনুচরেরা এসে তাঁকে ভেংচি কেটেছে হয়তো। সেই স্যাঁৎসেঁতে মাটি, ঠাণ্ডা ছায়া, বিকট মন্দিরটা, পুরোনো গাছের সার—সব রাত্রের অন্ধকারে একসঙ্গে কল্পনা করতে গিয়ে দম আটকে এল আমার।

আমি ফিসফিস করে বললুম 'সুমন্তদা, আমার ভয় করছে।'

সুমন্তদা শুকনো হাসি হাসল। 'কেন, তোর ভয়ের কী আছে?'

'কাল রাত্রে কি ভূত-টূত—'

'দূর পাগলা! মায়ের সেবকের কাছে কখনো ভূত আসে?'

'তবে—তবে কি মা নিজেই এসেছিলেন ?'—সেই হাতভাঙা ছায়ামূর্তিটার কথা ভাবতেই আমার রোমাঞ্চ হল : 'দর্শন দিয়েছিলেন আপনাকে ?'

একটু বিরক্ত হল সুমন্তদা।

'আমি কি রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব না সাধক রামপ্রসাদ যে কথায় কথায় সামনে এসে দাঁড়াবেন ? ওর জন্যে মহাপুরুষ হওয়া চাই—বুঝলি, জন্ম-জন্মান্তরের সাধনা চাই।'

'তা হলে কি ওই সাপটা—'

'দূত্তোর সাপ!'

ধমক খেয়ে আমি চুপ করে গেলুম; সুমন্তদা নৌকোর এক পাশে ঝুঁকে পড়ে নদীতে হাত ডুবিয়ে আঁজলা-আঁজলা জল মাথায় ছিটিয়ে দিতে লাগল।

'বলুন না, কী হয়েছিল—' আমি মিনতি করলুম আবার।

কাপড়ের খুঁটে মাথা মুখ মুছে নিয়ে সুমন্তদা পশ্চিমের আকাশের দিকে তাকালো। রাঙা আলোয় কয়েকটা জলের বিন্দু জ্বলতে লাগল চোখের পাতায়—ঠিক মনে হল কাঁদছে।

'বুঝলি—' নিজেই কথা শুরু করল এবার : 'কাল যেতে যেতে —সেই যেখানে আমরা বোঁদে খেয়েছিলুম, সেই পলাশপুর ছাড়িয়ে একটু এগিয়েছি, এমন সময়—'

'এমন সময় ?'

'একটা মস্ত পাকুড় গাছের তলায় গোঁ গোঁ করে কাতরানির আওয়াজ। চমকে চেয়ে দেখি, শাদা মতন কী একটা পুঁটলি পাকিয়ে পড়ে আছে সেখানে। সঙ্গে দেশলাই ছিল, কাঠি জ্বেলে দেখি গাছতলায় একটা বুড়ী, কুষ্ঠরোগী।'

মনে মনে নিরাশ হলাম। একটা ভয়ঙ্কর কিছুর কল্পনা জাগছিল, সেটা নেতিয়ে গেল। কুষ্ঠরোগী এমন একটা কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়। আমাদের এই গঞ্জেই তো হাটের দিনে একটা কুষ্ঠরোগী

রাস্তার ধারে বসে থাকে—থকথকে ঘা-ওলা বেঁটে বেঁটে হাত বাড়িয়ে ভিক্ষে চায় সকলের কাছে।

বললাম, 'ও।'

'দেখলাম, বুড়ীটার হাত-পাগুলো প্রায় খসে পড়বার জো। তাকানো যায় না—এমন অবস্থা। দেশলাইয়ের আলোয় চমকে একবার আমার দিকে চাইল, দেখলাম ঝাপসা চোখের কোণা দিয়ে জল গড়াচ্ছে। আমার দিকে তাকিয়েই চোখ বন্ধ করল, আবার গোঁ গোঁ করে আওয়াজ বেরুতে থাকল গলা দিয়ে।'

আমি আর দাঁড়ালুম না—চলে গেলুম। কী করতে পারি বল? সারা শরীর বোধ হয় পচে গেছে—কী বিশ্রী দুর্গন্ধ যে উঠছিল তোকে কী বলব! আজ হোক—কাল হোক—দু' দিন বাদে হোক, ও তো মরবেই। ওর কাছে দাঁড়িয়ে থাকলেই তো আমি আর ওর কষ্টের লাঘব করতে পারব না!

চলে এলুম মায়ের মন্দিরে। ভক্তিভরে মাকে প্রণাম করে উঠে বসলুম মন্দিরের চাতালে, শুরু করে দিলুম ধ্যান। ধ্যানের নিয়ম কী, জানিস তো? সমস্ত মনকে গুছিয়ে এনে দুটো ভুরুর মাঝখানে দাঁড় করাতে হয়, ভাবতে হয় ইষ্টদেবতাকে—আর এমনি করে ধীরে ধীরে বাইরের জগৎ লুপ্ত হয়ে যায়। তারপর জ্যোতিঃদর্শন—'

আমার বিরক্তি ধরে গেল। এ-সময় জ্যোতিঃদর্শন কে শুনতে চায়?

'তুমি যে সেই বুড়ীটার কথা বলছিলে।'

'আহা—থাম না। ধ্যান করতে যতই চেষ্টা করি, মন কিছুতেই স্থির হয় না—দুটো ভুরুর মাঝখান থেকে বার বার ছিটকে ছিটকে পড়তে থাকে। পাতার শব্দ পাই, হাওয়ার শব্দ আসে—ভাঙা মন্দিরের ফাঁকে-ফুকরে টিকটিকি-গিরগিটি ডাকে, তা শুনি। দুত্তোর, এ কি রকম হল? বাড়িতে শোওয়ার আগে মশারির মধ্যে বসে ধ্যান করি যখন, তখনও তো ঢের বেশি তন্ময়তা এসে যায় এর চাইতে।

তারপরে বুঝতে পারলুম। মনে পড়ে গেল, স্বামীজীকে ঠাকুরের আদেশ। দরিদ্র নারায়ণের সেবাই তোর ব্রত—সেই তোর তপস্যা। আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল বুড়ীর চেহারা—দেশলাইয়ের আলোয় সেই যেটুকু দেখতে পেয়েছিলুম। ভারী একটা কষ্ট হল রে! কোথায় ওর বাড়ি, কোথায় ঘর কে জানে—ভ্যাখ কিভাবে গাছতলায় পড়ে পড়ে মরছে। হাঁটতেও আর পারে না বোধ হয়—কোনো মতে হয়তো হামাগুড়ি দিয়ে এসে পৌঁছেছে এখানে। এখন যদি একটু জলও ওকে খেতে হয় তা হলে কত কষ্ট করে ওকে নেমে যেতে হবে নয়ানজলিতে—জানোয়ারের মতো মাথা নামিয়ে জল খাবে, তারপরে মুখ থুবড়ে ওখানেই পড়ে যাবে হয়তো, আর উঠতেও পারবে না!

আমার কানে যেন বেজে উঠল মায়ের আদেশ, স্বামীজীর বাণী। যা—যা—চলে যা এখান থেকে। আর তোকে এভাবে ধ্যান করতে হবে না স্বার্থপরের মতো। পথের সামনে একটা অসহায় মানুষকে মরতে দেখেও তুই চলে এলি? তোর লজ্জা করল না? তুই আবার রাত জেগে সুর করে "বীর বাণী" পড়িস? ছি—ছি!

আমি উঠে দাঁড়ালুম তক্ষুনি। পা চালালুম পলাশপুরের দিকে। কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছিল রে।'

'কিসের দেরি সুমন্তদা?'

সুমন্তদা একটু চুপ করে রইল, যেন আমার কথাটা শুনতে পায় নি সে। তারপর আবার আস্তে আস্তে বললে, 'সত্যি বলতে কী—ওই কুষ্ঠরোগীর সেবা করব—এ কথা ভাবতেই আমার গা একটু ঘিন ঘিন করে উঠল গোড়াতে। আর তাইতেই আমি বুঝতে পারলুম—কেন স্টিমারে সেই মহাপুরুষ আমাকে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন—কেন বলেছিলেন, আমার সময় হয় নি। আমি তৈরিই হতে পারিনি। কুষ্ঠরোগীকে সেবা করতে আমার ঘেন্না! মাতৃসেবকের মনে এসব সংস্কার!

তাড়াতাড়িই চলে এলুম—রাত তখন দুটো হবে। পাকুড় গাছটার কাছে আসতেই যেন খানিকটা খ্যাঁচোর-ম্যাচোর শব্দ—শেয়ালে ঝগড়া করছে। বোধ হল আমি এসে দাঁড়াতেই দু-তিনটে শেয়াল পাকুড়তলা থেকে বেরিয়ে মাঠের দিকে দিলে দৌড়। আর আমি দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে দেখি—'

আত্রাইয়ের ওপারে সূর্য ডুবল। নদীর এদিকে ছায়া নেমেছে, ওদিকে এখনো শেষ বেলাকার রঙ। একটু থেমে আবার বলতে লাগল সুমন্তদা, গলা কাঁপতে লাগল তার: 'কাঠি জ্বেলে দেখি—সে বীভৎস ব্যাপার কল্পনাও করা যায় না। রক্তে মাখামাখি, বুড়ীর হাত-পাগুলো আর নেই—কয়েকটা হাড়ের টুকরো ছড়ানো, বুক-পেটের অনেকটাই খেয়ে ফেলেছে, আর—আর—বুঝলি—সেই খাওয়া-বুকের ভেতরে হৃৎপিণ্ড না ফুসফুস কে জানে তিরতির করে অল্প কাঁপছে তখনো—ঠোঁট দুটো একটু একটু নড়ছে।'

আমি প্রায় চিৎকার করে উঠলুম।

'শেয়াল?'

'হ্যাঁ, শেয়াল। জ্যান্ত ছিঁড়ে খাচ্ছিল মানুষটাকে। পচা রক্ত-মাংসের গন্ধে চলে এসেছে, ওদের আর দোষ কী! আর ওই মরো-মরো মানুষটাই বা ওগুলোকে কি করে ঠেকাবে তাই বল। আমি আর একটু দেরি করে এলে সবটাই খেয়ে ফেলত।' আমার মাথা ঘুরতে লাগল।

'দেশলাইয়ের আলোয় যা দেখলুম—তাতে মনে হল ছুটে পালাই। এমন কদর্য আর ভীষণ জিনিস জীবনে আমি আর দেখি নি। আমি আর কী করতে পারি এর পর—যা করবার সে তো মিটেই গেছে। মনের মধ্যেটা যেন পুড়ে যেতে লাগল। আমি যদি তখন অমনি করে চলে না যেতুম—থাকতুম ওর কাছে, মুখে একটু জল-টল দিতুম, তা হলে বুড়ীটাকে অন্তত জ্যান্ত শেয়ালে ছিঁড়ে খেতে পারত না, হয়তো আরো দু-চারদিন বেঁচে থাকত।'

আসবার জন্যে পা বাড়িয়েছি, দেখলুম এদিক ওদিক দপ দপ করে জ্বলছে কতগুলো হিংস্র সবুজ চোখ। ওই হারামজাদা শেয়ালেরা। এখনো আশা ছাড়ে নি, লকলকে জিভ মেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি একটু সরে গেলেই হয়। তারপরে এসে আবার খাওয়া আরম্ভ করে দেবে।

না—আর চলে আসা যায় না। বুড়ী তো শেষ হয়ে গেছে—আর পনেরো মিনিট বিশ মিনিট বড় জোর—তারপর বুকের ভেতরের ওই কাঁপুনিটুকু থেমে যাবে চিরকালের মতো। কিন্তু তাই বলে শেয়ালেরা ওকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে, সে হতেই পারে না, কিছুতেই না।

লাঠি তো আমার হাতে ছিলই। আমি দাঁড়িয়ে গেলুম।

বুঝলি, শেয়ালগুলো শয়তানের চাইতেও লোভী! তার ওপর রক্ত-মাংসের স্বাদ পেয়েছে, হারামজাদারা কি আর নড়তে চায় নাকি ওখান থেকে। একটু অন্যমনস্ক হই—অমনি দেখি, একপাশ থেকে একজোড়া সবুজ চোখ গুটি গুটি এগিয়ে আসছে রক্ত-মাংসের পিণ্ডিটার দিকে। রাস্তা থেকে মাটির ঢেলা কুড়িয়ে ছুঁড়ে মারি, খানিকটা দৌড়ে পালায়, আবার তারপরেই দেখি টিপে টিপে চলে আসছে এদিকে।

সারা রাত তাড়ালুম ব্যাটাদের। তারপর ভোরের আলো ফুটল—তখন পালিয়ে গেল যে যেদিকে পারে। কটা গরুর গাড়ী আসছিল, মাঠের ভেতর দিয়ে চৌকিদারকে আসতে দেখলুম, আমি চলে এলুম তখন।'

সব শুনে আমার হাত-পা আতঙ্কে জমে গিয়েছিল।

আর বুড়ীটা?

'আসবার সময় সেদিকে আর চাইতে পারি নি, সাহসে কুলোল না রে। আমি সুমন্ত ঘোষ, কত মানুষ পুড়িয়েছি শ্মশানে, জলে-ডোবা মড়া ফুলে ঢোল হয়ে ঘাটে এসে লেগেছে—লোকে পালিয়েছে তা দেখে; আমি বাঁশ দিয়ে ঠেলে ঠেলে সে মড়া আবার

স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছি। কিন্তু বুড়ির দিকে আর চাইতে পারলুম না। শরীরের যেটুকু বাকী ছিল সে তো কখন মরে শক্ত হয়ে গেছে—এবার চৌকিদার এসে দেখে থানায় খবর দেবে নিশ্চয়, ওরা ডোম পাঠাবে, তারাই ঝোলায় করে তুলে নিয়ে পুঁতে-টুঁতে দেবে যেখানে হোক।'

সন্ধ্যায় আত্রাইয়ের জল কালো হয়ে গিয়েছিল। আমি সুমন্তদাকে আবছা আবছা দেখছিলুম, মনে হচ্ছিল ওর চোখ বেয়ে জল পড়ছে। বুড়ীর জন্যে আমার কতটা মায়া হচ্ছিল মনে নেই, কিন্তু নিদারুণ আতঙ্কে আমার দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইছিল—যেন চোখের সামনে আধ-খাওয়া সেই বিকট শরীরটা দেখতে পাচ্ছিলুম আমি। মনে হল, যদি কখনো এমন হয়—আমি কোনোদিন অসুস্থ হয়ে নির্জন কোনো রাস্তার ধারে পড়ে থাকি রাতের বেলায়, তা হলে শেয়ালেরা এসে আমাকেও কি ওই ভাবে—

'সুমন্তদা, বাড়ী চলুন।'

'হ্যাঁ, চল'—অন্যমনস্ক হয়ে উঠে পড়ল সুমন্তদা।

পথে আসতে আসতে বললে, 'মণ্টু, কোনো কিছুরই মানে হয় না—যদি জীবনে মানুষের সেবাই না করতে পারি।'

একটু দূরেই ঝোপের ভেতর দিয়ে একটা ছোট জন্তু দৌড়ে গেল। রোজই ওদের দেখি, কিন্তু আজ দেখবামাত্র শিহরণ জাগল, দাঁড়িয়ে পড়লুম তৎক্ষণাৎ।

'সুমন্তদা—শে—শেয়াল!'

নিজের ভাবনার ভেতরেই মগ্ন ছিল সুমন্তদা, ভারী বিরক্ত হল।

'শেয়াল তো কী হয়েছে? তোকে আমাকে ধরে খাবে নাকি এখন? তুই এত ভীতু না—যে জীবনে তোর কিচ্ছু হবে না।'

সেই রাতে আমার ভালো ঘুম হল না। মনে আছে খুব বিশ্রী স্বপ্ন দেখেছিলুম—যেন বল খেলতে খেলতে বলটা হঠাৎ একটা ঝোপের মধ্যে হারিয়ে গেল, খুঁজছি—খুঁজছিই, তারপর অন্ধকার

হয়ে গেল চারদিকে। বল তো দূরে থাক, বেরুবার রাস্তাই খুঁজে পাই না, যেদিকে যাই—শুধু ঝোপ আর কাঁটা ঝোপ—যেন আমাকে আঁকড়ে ধরেছে তারা। আর সেই সময় আমাকে গোল হয়ে ঘিরে ধরল কতগুলো প্রাণী, হিংস্র সবুজ চোখ নিয়ে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে তারা—যেন একটু ফাঁক পেলেই এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে আমার ওপর।

আমি চীৎকার করে উঠলুম।

আমাকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিলেন মা: 'কী হয়েছে মণ্টু, চেঁচিয়ে উঠলি কেন?'

মাকে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরে আমি বললুম, 'খুব খারাপ স্বপ্ন দেখছিলুম মা।'

মা আস্তে আস্তে আঙুল বুলিয়ে দিতে লাগলেন। বললেন, 'কিছু না—কিছু না, দুর্গা—দুর্গা!'

জানলার বাইরে শুকতারা দপ দপ করছিল। ঠিক মা-র চোখের মতো। মা-র বুকের ভেতর মাথা গুঁজে আমি ভাবতে লাগলুম—মানুষের সেবা করতে চায় সুমন্তদা, করুক; কিন্তু নিজের মা-কে ফেলে চলে এল কী করে?

পাঁচ

'জীবনে তোর কিচ্ছু হবে না—'সুমন্তদার কথা।

কিছুই হয় নি। আরো পাঁচজন সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলের মতো মাঝারিভাবে লেখাপড়া শিখেছি, ঢুকেছি কলেজের মাস্টারিতে, একটানা—বর্ণহীন দিনগুলো পেরিয়ে চলেছি বছরের পর বছর। কোনো বড় স্বপ্ন দেখি নি, কোনো আদর্শকে বুকের ভেতর জ্বেলে রাখি নি আলোর মতো। আমি যা হয়েছি এর অতিরিক্ত কী আর হতে পারতুম। আমি তাদেরই একজন—যারা সেন্‌সাসের সংখ্যাতত্ত্বে, ভোটারের তালিকায় অসংখ্যের ভেতরে নির্বিশেষ হয়ে আছে, জনতার সীমানা ছাড়িয়ে কোনোদিন অন্যতম হওয়ার কল্পনাও করি নি।

কিন্তু সুমন্তকুমার ঘোষ ?

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-কালী দ্য মাদার—ভবানী পাঠকের সাধনপীঠ ? 'অপেক্ষা করে আছি রে—ডাক এলে আমাকে আর কোথাও খুঁজে পাবি না তোরা।'

'সন্ন্যাসী হয়ে যাবে—না ?'

'নিশ্চয়।'

'আমাদের কাছে আর আসবে না সুমন্তদা ?'

'আসতে পারি—যদি কখনো প্রয়োজন পড়ে। তবে তখন আমি আর তোদের সুমন্তদা থাকব না।'

'তোমার অন্য নাম হবে, তাই না ?'

'শুধু অন্য নাম ? জন্মান্তর ঘটে যাবে।'

দীপু গালে এক টুকরো আমসত্ত পুরে নিয়ে স্লেটে বোধ হয় কাক আঁকবার চেষ্টা করছিল একটা। হঠাৎ 'কাঁচপোকা—বলে বাড়ির দক্ষিণের দেওয়াল বেয়ে যেখানে নীল অপরাজিতা

ফুটেছে রাশি রাশি—ছুটে গেল সেদিকে। এদিকে আমি হাঁ করে চেয়ে রইলুম সুমন্তদার মুখের দিকে।

'জন্মান্তর ?'

'নিশ্চয়। তখন আমার আর কোনো পূর্বাশ্রম থাকবে না।'

'পূর্বাশ্রম ? তার মানে কী ?

'আমি অন্য লোক। আমি সন্ন্যাসী। আমার মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন—ঘর-দুয়োর কিচ্ছু থাকবে না। আমি নতুন মানুষ। সুমন্ত বলে কেউ ডাক দিলে আর সাড়া দেব না আমি। তুই হয়তো বলবি—আপনি সুমন্তদা না? আমি বলব—কে সুমন্তদা? ও নামের কাউকে তো আমি চিনি না। তোমাকেও চিনি না আমি।'

'সে কি!'

একটা অনুকম্পার হাসি সুমন্তদার ঠোঁটে: সন্ন্যাসের তাই নিয়ম।'

তাই নিয়ম? জন্মান্তর?

সামনে সমুদ্র। দুপুরের রোদে নির্জন নীলম্ রোডে ঢেউয়ের একটানা নিশ্বাসের শব্দ। তাল-নারকেলের হাওয়ার মাতামাতি। সুমন্তদার জন্মান্তর কি শেষ পর্যন্ত এস কে ঘোষম হয়ে? এই ঘড়ি সারাইয়ের কাজই কি তাঁর সন্ন্যাসের শেষ লক্ষ্য? তাই কি আমাকে চিনেও চিনতে চান নি।

তবু সংসারের মায়া কেটেও তো কাটল না। তবুও তো বলতে হল শেষ পর্যন্ত: 'হাঁ মন্টু, আমিই তোমার সুমন্তদা।' লিখতে হল ঘড়ির রসিদে: 'নো চার্জ।'

শুধু একটা প্রশ্ন আমার বুকের ভেতরে কান্নার মতো কেঁপে উঠেছিল—আজ ত্রিশ বছর ধরে আমার মনের কাছে যে প্রশ্নের কোনো উত্তর মেলে নি।

'কল্যাণীদি কোথায় গেছে সুমন্তদা? জানেন আপনি? বলতে পারেন—কল্যাণীদি কোথায়?'

হয়তো কাল ঘড়ি ফেরৎ নিতে গিয়ে এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে

হবে আমাকে। হয়তো এই প্রশ্নটা আমি কোনোদিন—কোনোমতেই জিজ্ঞেস করতে পারব না।

কিন্তু কল্যাণীদি-কে একটু সরিয়ে রাখতে হবে এখন। আর একঝাঁক সমুদ্রের পাখি সামনে। আরো অনেক—অনেক স্মৃতি ॥

বোধ হয় দু-তিনটে বছর পেরিয়ে গেছে এর ভেতরে। দীপু এখন বড় হয়ে মেয়েদের প্রাইমারী স্কুলে পড়তে যায়, আমি উঠেছি আর একটু ওপরের ক্লাসে। এখন আর স্কুলের প্রাইজে যোগীন সরকারের ছড়া-গল্পের বই দেয় না—দেয় 'আশুতোষের ছাত্রজীবন', 'নিগ্রোজাতির কর্মবীর', 'হিরোজ অব বেঙ্গল', 'ল্যামস টেল্‌স্ ফ্রম শেক্‌সপীয়র।' এখন বর্ষা ছাড়া অন্য সময়ে আমি অনায়াসে আত্রাই নদী সাঁতরে পেরিয়ে যেতে পারি। বছর-খানেক আগে হাফ-প্যাডাল করে সাইকেল চালাতুম, এখন পুরো প্যাডাল করতে পারি। এখন জানি, বালুরঘাট এই জেলার একটা মহকুমা শহর—সেখানে যেতে রোমাঞ্চিত হওয়ার কিছু নেই—শুধু—শুধু ওই পাঠক দেউলের জঙ্গলটা ছাড়া।

ওই জঙ্গল—সেই ভাঙা মূর্তি—আজও আমার কাছে আতঙ্ক। আর পথের ধারে কোথায় সেই পাকুড় গাছটা? জানতে চাই না আমি, কিছুমাত্র উৎসাহ নেই জানবার।

'সুমন্তদা, আর আপনি অমাবস্যার রাত্রে জঙ্গলে যান নি তো?'

'গেলেও বলব নাকি তোকে? তুই যা কাওয়ার্ড!'

আর সুমন্তদা না বললেও জানবার উপায় নেই কোনো। বাইরের দিকের ঘরে সে শোয়। রাত্রে ঘরে তালা দিয়ে টুপ করে বেরিয়ে গেলে আর তেমনি চুপি চুপি ফিরে এলে কেউ টেরও পাবে না। সুমন্তদা কিছু বলে না, কিন্তু আমি ভাবতে থাকি, এতদিন সাধনা করে অনেক দূর এগিয়েছে নিশ্চয়, তার ডাক এবার এসে পড়ল বলে।

রাত্রে ঘুম না আসা পর্যন্ত 'বীর বাণী' শুনি, আরো কী সব সুর করে পড়ে বুঝতেও পারি না—ঘরে তার নিজের হাতে তৈরি

কেরোসিন-কাঠের সেল্‌ফ্‌ একটা, তাতে কিছু বই রাখা আছে—তাই থেকেই পড়ে নিশ্চয়। যেন অনেক দূর থেকে গুন গুন করে অদ্ভুত রহস্যময় হয়ে পড়বার শব্দটা আসে, আমার গা ছম ছম করে, পাঠক দেউলের বন আর সেই ভয়ঙ্কর পাকুড় গাছটার কথা মনে পড়ে যায়।

কিন্তু সুমন্তদা আর শতমূলী আনতে চায় না—কবিরাজ মশাই মারা গেছেন।

সেই দিনটা ভেসে উঠল সামনে। বাবা বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে একটা অর্ধ-সাপ্তাহিক ইংরিজি খবরের কাগজ পড়ছেন। কাল সন্ধ্যার ডাকে এসেছে সেটা। সেকালে বাংলাদেশের দূরের পাড়া-গাঁয়ে দৈনিক কাগজ এখনকার মতো পৌঁছুত না—সাপ্তাহিক অর্ধ-সাপ্তাহিক বিরাট বিরাট খবরের কাগজেরই চলন ছিল বেশি।

আমি আর দীপু যথানিয়মে আর একটু দূরে মাদুরে বসে পড়া করছি। সুমন্তদা পড়াচ্ছে আমাদের। এখন আর আমাকে আগের মতো চোখ বুজে পড়াতে পারে না, ইংরিজি শব্দ দেখবার জন্যে কখনো ডিক্‌শনারী দেখতে হয়, নইলে বাবা কাছে থাকলে জিজ্ঞেস করতে হয় তাঁকে।

বাবা কাগজটা নামিয়ে চশমা খুললেন। ডাকলেন, 'সুমন্ত ?'

'কিছু বলছেন কাকামণি ?'

বাবা বললেন, 'তোমার আর নাসিমপুরের দিকে না যাওয়াই ভালো।'

রান্নাঘরে মা বোধ হয় শুনছিলেন। বাড়িতে বামুনঠাকুর আছে, তবু ঠাকুরের কাছে গিয়ে পিঁড়ি পেতে বসবেনই, মা-র এই নিয়ম। রান্নাঘর থেকে মা-র গলা পাওয়া গেল: 'হাঁ, ভালো করে বলে দাও ওকে। আমি তো ওর সঙ্গে কথায় পারি না—কী যে বলে যায় বুঝতেও পারি না সে সব।'

সুমন্তদার মুখ রাঙা হল।

'নাসিমপুরে যেতে বারণ করছেন কেন কাকামণি ?'

'খুব সোজা কারণ। ওই কলেরা এপিডেমিকের মধ্যে তোমার দৌড়োদৌড়ি করবার কোনো মানে হয় না।'

অতিমাত্রায় আশ্চর্য হয়ে গেল সুমন্তদা।

'আপনিও এ কথা বলছেন কাকামণি? এ অবস্থায়ও দেশের মানুষের সেবা করব না?'

আমি ফস করে বলে ফেললুম, 'হুঁ—সেই বুড়ীটা—'

'সেই বুড়ীটা মানে—' বাবা প্রশ্ন করলেন আমাকে।

সুমন্তদার চোখের দিকে তাকিয়ে আমি সামলে নিয়েছি ততক্ষণে। বললুম 'না বাবা, কিছু না।'

'কিছু না?'—বাবা আরো সন্দিগ্ধ হলেন।

মিথ্যে কথা বলা উচিত নয়, প্রাণান্তেও বলবে না—জীবন বিসর্জন দেবে সত্যের জন্যে। এই সব উপদেশ সুমন্তদার মুখ থেকে অনেকবারই শুনতে হয়েছে আমাকে। কিন্তু সেই মুহূর্তে বোধ হয় তার মনে পড়ল: 'সত্যম্ অপ্রিয়ম্' বা 'বিপজ্জনকম্' না বলাই এ ক্ষেত্রে প্রাজ্ঞতার কাজ হবে। ফস করে বলে বসল: 'না—মানে একটা বুড়ী একদিন ভিক্ষে করতে এসেছিল।'

বাবা বললেন, 'তা আসুক। কিন্তু নাসিমপুরে তোমার আর যাওয়ার দরকার নেই।'

'আমি তো সাবধান হয়েই নার্স করি কাকামণি। তা ছাড়া বাড়ি ফেরবার আগে স্নান করে—ডাক্তারখানা থেকে ডিজ্‌ইন্‌-ফেক্‌টেড্ হয়ে—

'সে কথা হচ্ছে না। এখন অনেক ডাক্তার এসে গেছেন ওদিকে, রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুরাও কাজ করছেন। তুমি না গেলেও কোনো ক্ষতি হবে না।'

'কিন্তু কাকামণি, মানুষের সেবা—

বাবা বাইফোক্যাল চশমাটা আবার পরে নিয়ে সুমন্তদার দিকে ভুরু কুঁচকে চাইলেন, পত্রপাঠ কুঁকড়ে গেল সুমন্তদা। বাবা বললেন, 'তুমি ভালো কাজ করছ, কোনো সন্দেহ নেই তাতে। কিন্তু তোমার

সম্পর্কে আমাদেরও একটা দায়িত্ব আছে। তোমার যদি কোনো অসুখ-বিসুখ করে, তা হলে—'

বলতে বলতেই মা-ও বেরিয়ে এলেন রান্নাঘর থেকে।

'কালই তো তোর মা-র চিঠি পেয়েছি। লিখেছেন, আমার ছেলেটা পাগল, উহার মতি-গতির স্থির নাই। তোমাদের কাছে রহিয়াছে বলিয়া নিশ্চিন্ত আছি—সর্বদা দৃষ্টি রাখিয়ো।'

'হুঁ।'—বাবা আবার খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে বললেন, 'যা বললুম মনে থাকে যেন। আর নাসিমপুরে যাওয়ার কোনো দরকার নেই তোমার।'

সুমন্তদা ঘাড় নীচু করে বসে রইল গোঁজ হয়ে।

মা বললেন, 'কলেরার রুগী, তাই ঘাঁটতে যাচ্ছে রোজ। 'হাঁ রে, তোর ভয়ডরও নেই নাকি?'

"ছিন্নকণ্ঠ ছাগের রুধির, দেখে তোর হিয়া কাঁপে? কাপুরুষ, ভয়ের আধার।"—সুমন্তদার মুখে বারবার শোনা এই সব বীরত্ব-ব্যঞ্জক লাইন আমার মনে এসে গিয়েছিল, কিন্তু বুঝতে পারলুম আপাতত ওগুলো আবৃত্তি করা উচিত নয়।

বিকেলে স্কুল থেকে ফেরবার পরে মাঠের দিকে বকুলতলায় আমাকে ডেকে নিয়ে সুমন্তদা বললেন, 'দেখলি?'

বললুম, 'কী দেখব?'

'একেই বলে সংসার!'—বলেই বুক-ভাঙা এক দীর্ঘশ্বাস।

আমার হাতে একটা গুলতি ছিল, তাই দিয়ে আমি খানিক দূরে একটা চিলকে তাক করবার চেষ্টায় ছিলুম। সুমন্তদা ফস করে আমার হাত থেকে গুলতি কেড়ে নিল।

'ধেত্তেরি গুলতি! একটা সিরিয়াস কথাও কি বলা যাবে না তোর সঙ্গে?'

আমি বললুম, 'কী হয়েছে?'

'বলছি না—সংসার একেই বলে?'

'কাকে বলে?'

'তোর মাথা যে কী মোটা!'—ভীষণ বিরক্ত হল সুমন্তদা: 'পাড়া গাঁয়ের ইস্কুলে দু-একটা প্রাইজ-ট্রাইজ পাস—বাঁশ বনে শেয়াল রাজা! দেখলি নে আমার অবস্থা? কাকামণি নাসিমপুরে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন।'

ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম হল এতক্ষণে।

'না-ই গেলে আর। বাবা তো ভালো কথাই বলেছেন।'

'তোর মুণ্ডু!'—একটা বকুল গাছের তলায় বসে পড়ে সুমন্তদা বললে, 'অসুস্থ পীড়িত মানুষকে সেবা করব—জীবনে এর চাইতে বড়ো কাজ আর কী আছে! তার জন্যে প্রাণ যায় তো যাক্ না। কিন্তু কাকামণি—'

কিছুক্ষণ চুপ। তারপর সুমন্তদা আবার বললে, 'সংসারের চেহারাই এই। স্নেহের বন্ধন, মায়ার বন্ধন। চারদিক থেকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরে। আর মা-র কাণ্ডটাও ছ্যাখ্ একবার—অত বিতং দিয়ে খুড়িমাকে চিঠি না লিখলেই হত না? যত সব!'

কী জবাব দিই? শুনে যেতে লাগলুম।

বুঝলি মণ্টু, 'এবার আমায় ছাড়তে হবে।'

'কী ছাড়তে হবে?'

'এই সংসার। এই স্নেহের বন্ধন। সব মায়া কাটিয়ে চলে যাব।'

'কিন্তু তুমি যে বলেছিলে, সময় হলে ডাক আসবে।'

'ডাক আসতে আসতে বুড়িয়ে যাব নাকি?'—স্টিমারে সেই স্বপ্নে দেখা মহাপুরুষের ওপর সুমন্তদার ভক্তি একটু টলেছে বলে মনে হল: 'এখন দেখছি সে আশায় বসে থাকলে আমি একেবারে পাঁকে ডুবে যাব! নিজের খেয়ালে কী স্বপ্ন দেখলুম—তাই আঁকড়ে ধরে বসে আছি, ব্যস।'

'কিন্তু তোমাকে তো এক মহাপুরুষ স্বপ্ন দিয়েছিলেন।'

'রাখ তোর মহাপুরুষ! বেশ প্ল্যান করে বেলুড় যাওয়ার জন্যে বেরিয়েছিলুম—' সুমন্তদা গজ গজ করতে লাগল: 'সব গেল মাটি

হয়ে। তাছাড়া এদিকে যে আরো কত ডেন্‌জারাস্‌ ব্যাপার ঘটছে—'

'কী ডেন্‌জারাস্‌ ব্যাপার ?'

'কাউকে বলবি না ?'

'না—কক্ষণো না।'

'কিন্তু এক্ষুণি তো সেই বুড়ীটার কথা প্রায় বলে দিয়েছিলি।'

'মুখ ফসকে এসে গিয়েছিল। কিন্তু সামলে নিয়েছি তো। মাইরি বলছি সুমন্তদা, কাউকে বলব না আমি।'

আশ পাশে কতকগুলো বকুল ফল ছড়িয়ে পড়েছিল, তারই একটা তুলে নিয়ে কিছুক্ষণ নখ দিয়ে কুটি-কুটি করে কাটল সুমন্তদা। তারপর বললে, 'জানিস—দিন পনেরো আগে আমার মা কী একটা ভীষণ চিঠি লিখেছে আমাকে ? শুনলে তোর মাথা ঘুরে যাবে।'

'সে আবার কী ?'

'সেই কথাই তো বলছি। মা লিখেছে, বাবা সুমন্ত, আর কতদিন এভাবে বাউণ্ডুলের মতো ঘুরিয়া বেড়াইবে। তোমার বয়স বাইশ বৎসর পার হইয়া গেল আমিও বুড়া হইতেছি, আর কতদিন এভাবে পড়িয়া থাকিব। আমি ভাবিয়াছি, এইবারে তোমাকে বিবাহ দিয়া সংসারী করিব—' বলতে বলতে সুমন্তদার মুখ রাঙা হয়ে উঠল: 'লোকের মা কত স্নেহময়ী হয়—যেন দয়ার প্রতিমা—খুড়িমাকেই দ্যাখ্‌ না! আর আমার মা ? একেবারে সর্বনাশিনী!'

'এতে সর্বনাশের কী আছে সুমন্তদা ?'—সরল বিশ্বাসে প্রশ্ন করলুম আমি।

'তাই যদি বুঝবি, তা হলে আর মাথা মোটা বলব কেন তোকে ? মা আরো কী লিখেছে, জানিস ? হারাণ দত্ত মশাইয়ের মেয়ে ফুলুকে তো দেখিয়াছ, এখন বেশ সুন্দর আর ডাগোর-ডোগর হইয়াছে। দত্তমশাই তোমার সহিত ফুলুর বিবাহ দিতে ইচ্ছুক। তিনি আরো বলিয়াছেন, এই কন্যাকে বিবাহ করিলে তিনি তোমাকে বাটা-জোড়ের দত্তদের ওখানে একটি চাকুরির ব্যবস্থাও করিয়া দিবেন!'

—সুমন্তদা প্রায় গর্জে উঠল: 'মা! জননী মা! তা নইলে একেবারে মাথায় পা দিয়ে ডোবানোর বন্দোবস্ত।'

'বেশ তো সুমন্তদা, আপনি বিয়ে করবেন—ভালোই তো।'

'চুপ কর বোকারাম। কিচ্ছু বুঝিস না তুই। বিয়ে করব—চাকরি করব—' সুমন্তদা যেন নিজের মা-কেই মুখ ভ্যাংচাতে লাগল: 'বাটাজোড়ের দত্ত বাড়িতে চাকরির ব্যবস্থা করিয়া দিবেন!—এই জন্যেই আমি স্বামীজীর বই পড়ি, মায়ের সাধনা করি।'

'বিয়ে করলে সাধনা হবে না সুমন্তদা?'

'চুপ কর, বলছি! ওরে গর্দভ, স্বামী বিবেকানন্দ বিয়ে করেছিলেন?'

'ন্—না তো।'

'আর বুদ্ধদেব কী করেছিলেন? ইতিহাস তো পড়েছিস।'

'স্ত্রী-ছেলে ফেলে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন।'

'আর শ্রীচৈতন্য?'

'ঠিক জানি না তো?'

'কী জানিস তা হলে? পাড়া গেঁয়ে ইস্কুলে প্রাইজ পাস—তাও আবার এই জংলা দেশে, বাঁশ বনে শেয়াল রাজা। পড়তিস অশ্বিনীকুমারের বরিশালের কোনো ইস্কুলে—প্রমোশনই পেতিস না!'

আমি ঘাবড়ে গিয়ে চুপ করে থাকলুম।

'শ্রীচৈতন্যও বউ ফেলে রেখে সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেলেন।'

আমি বললুম, 'বেশ তো। আপনিও তাই করুন। আগে বিয়েটা করে ফেলুন, তারপর বউ ফেলে সাধু হয়ে বেরিয়ে চলে যাবেন।'

সুমন্তদা অবাক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ ফট্‌ফট্ করে চেয়ে রইল আমার দিকে।

'ইস, কী মাথামোটা! পেরেক ঠুকলেও ঢুকবে না দেখছি।'

আমি ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারছিলুম না। গালাগাল খেয়ে বসে থাকলুম ম্লান মুখে।

সুমন্তদা বললে, 'আমি মাকে খুব কড়া করে চিঠি দিয়েছি একটা। তাতে লিখেছি, খবর্দার, ভুলেও এই সমস্ত মতলব মনে আনিবে না। আবার যদি কোনোদিন আমাকে বিবাহের কথা লেখো—সেই দিনই আমি গেরুয়া পরিয়া হিমালয় পর্বতে রওনা হইয়া যাইব—কোনো জন্মেও আমাকে আর দেখিতে পাইবে না।'

আমি বললুম, 'জ্যেঠিমার মনে খুব কষ্ট হবে।'

'হোক গে! এইসব মায়ার বন্ধনে এমনি করেই ঘা দিতে হয়। কিন্তু আমি ভেবেছি আর একটা বছর দেখব।'

'কী দেখবে?'

'ডাক আসে কি না। যদি না আসে—'

'না আসে?'

'নিজেই চলে যাব একদিন।'

'কোথায়?'

'হিমালয়ে। মা-কে একদম বিশ্বাস নেই, বুঝলি? লোকের মা হয় মূর্তিমতী করুণার ধারা, আর আমার—'

…নীলম্ রোডে এক্কার আওয়াজ—টক টক করে ঘোড়ার পায়ের শব্দ। স্মৃতির ছবি বদলালো। বাড়িতে শনিপূজো চলছে। আমাদের হেড পণ্ডিত মশাই 'শনির পাঁচালী' পড়ছেন সুর টেনে।

'শনিবারে শনিপূজা সব তেয়াগিয়া।
শনি তুষ্ট হলে তার দুঃখ নাহি ঘটে,
আপনি রাখেন শনি তাহাকে নিকটে—'

মা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সুমন্ত কই রে?'

'জানি না তো।'

'জানিস না কি রকম? রাতদিন শিষ্য হয়ে পেছনে ঘুরছিস, কোথায় গেছে সে খবর জানিস নে? দেখে আয় তো ডাক্তারবাবুর ওখানে, বোধ হয় পাশা নিয়ে বসেছে।'

'তাস-দাবা-পাশা—তিন কর্মনাশা—মার মুখে শুনেছি। সুমন্তদার একটু পাশা খেলার ঝোঁক আছে—মধ্যে মধ্যে সন্ধ্যেবেলায় ডাক্তারবাবুর ওখানে পাশার আড্ডাও বসে। কিন্তু নেশা ধরতে কখনো দেখি নি। যেই কখনো গিয়ে খবর দিয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়েছে খেলা ফেলে।

ডাক্তারবাবু হয়তো বলেছেন, 'আরে উঠছ কেন, এই বাজীটা অন্তত শেষ করে যাও।'

'না কাকা, পাকা ঘুঁটি কাঁচিয়ে বের করেছে ওরা—খেলা ঘুরে যাবে, অনেক দেরি হবে বাজী উঠতে। আমি চললুম।'

হয়তো দান ফেলতে যাচ্ছিল, হাতের পাশাগুলো ছড়িয়ে দিলে খড় খড় করে।

'আর কাউকে নিয়ে বসুন কাকা, আমি চললুম।'

না—কোনোদিন কোনো নেশা দেখি নি সুমন্তদার। অদ্ভুত নির্লোভ সে। সন্ন্যাসী হওয়ার জন্যেই যে জন্মায়—কোনো আসক্তিই থাকতে নেই তার।

মা-র কথা শুনে আমি ডাক্তারখানার দিকে চললুম সুমন্তদাকে খুঁজতে।

কিন্তু আজ যে পাশার আসর বসেনি সে দূর থেকেই দেখতে পেলুম আমি। খেলাটা হয় ডাক্তারখানার বারান্দায় মাদুর পেতে, লণ্ঠন জ্বেলে। সেখানে আজ কেউ নেই। শুধু দুটো কুকুর ঘুমুচ্ছে সেখানে, আর সামনের ছোট মাঠটুকুতে কম্পাউণ্ডারবাবুর আধ-পাগলা বুড়ো বাপ খুব বড় বড় পা ফেলে পায়চারী করছেন। এই ভদ্রলোককে দেখলেই আমার ভয় করে, খপ করে চেপে ধরে অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন করতে থাকেন।

ইস্কুলে পড়িস, তাই না? শুনেছি তুই ভালো ছেলে। বল্ দিকি এ লাইনগুলো কার লেখা?

ভূতনাথ ভূতনাথ দক্ষযজ্ঞ নাশিছে
যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্ট-অট্ট হাসিছে?'

একমাত্র জব্দ থাকেন সুমন্তদার কাছে। ওই রকম কিছু জিজ্ঞেস করতে এলেই সুমন্তদা কট-কট-কটর-কটর করে কী সব ইংরিজি বলতে থাকে, কম্পাউণ্ডারবাবুর বাবা কেমন ঘাবড়ে গিয়ে সুড় সুড় করে চলে যায় বাড়ির মধ্যে।

আমি তো এখন ইংরিজি পড়ি, কিন্তু সুমন্তদা যে কী বলে, তার এক বর্ণও বুঝতে পারি না।

একদিন জিজ্ঞেস করেছিলুম, সুমন্তদা, কী বললেন আপনি?'

সুমন্তদা গম্ভীর হয়ে বলে যেতে লাগল এই রকম কিছু শব্দ—আবছাভাবে যা মনে পড়েঃ 'ইন দি লেবিরিন্থ অব ডিহাইড্রেটেড ক্যাটাক্লিজম্, ইন্ট্রোসপেকটিভ্ ক্যাটাকুম ওয়াজ ভ্যাক্সিনেটেড্ বাই এ ভোসিফোরাস জাক্স্টাপোজিশন অব দি ম্যাগনানিমাস হাইপোডার্মিক সীরিন্জ—'

শুনতে শুনতে মাথা ঘুরে গিয়েছিল। ঘাবড়ে গিয়ে বলেছিলুম, 'থাক—থাক। মানে কী ওর?'

মানে? মানে কি আমিই জানি নাকি একটা শব্দেরও? ডিক্সনারী থেকে জোগাড় করেছি ওগুলো। বুড়োকে ঘাবড়ে দিতে হবে তো। নইলে হয়তো ফস করে জিজ্ঞেস করবেঃ

চলে কপাল ধ-ধ-ধ
কার মাথা এটা হী হী হ
ধাকিটি ধাকিটি ধানিয়া!'

আরো আঁতকে আমি বলেছিলুম, এই কবিতাই বা কে লিখেছে সুমন্তদা?'

'দুত্তোর! কে জানে! বুড়োই লিখেছে হয়তো বা। পাগলের খেয়াল।'

পরে বড় হয়ে জেনেছি এ-সব কার লেখা। কিন্তু বুড়োকে দেখে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাবার পক্ষে এই যথেষ্ট।

আজও সামনের মাঠে বড় বড় পায়ে ভদ্রলোককে চলে বেড়াতে

দেখে আমি আর দাঁড়ালাম না। তৎক্ষণাৎ এক দৌড়ে গঞ্জের রাস্তায়। কিন্তু সুমন্তদা গেল কোথায় ?

সেই আড়তদার শশীবাবুর ওখানে ? কিন্তু সে তো অনেক দূরে।

ঠিক তখনি আর একটা কথা মনে পড়ে গেল আমার।

প্রবোধবাবুর খুব অসুখ রে! লোকটার দেখবার কেউ নেই। একলা ঘরে পড়ে ছটফট করছে।

সুমন্তদা একবার বলেছিল কাল সকালে পড়তে বসার সময়।

প্রবোধবাবু—প্রবোধ মণ্ডল। ইউনিয়ন বোর্ডের কেরাণীবাবু। শীত-গ্রীষ্ম বারো মাস একটা ছেঁড়ামতন কোট গায়ে। লম্বা রোগা চেহারা—ঘাড় কুঁজো—চোখের চশমাটাকে দড়ি বেঁধে পরতে দেখেছি কখনো কখনো। বিদেশী মানুষ—উলুবেড়ে না কোথায় যেন তাঁর বাড়ি। দেখলেই মনে হয়, কখনো হাসেন না, খুশি হন না—সব সময়েই তলিয়ে রয়েছেন কী একটা দুশ্চিন্তার ভেতরে। মুখে খোঁচা খোঁচা কাঁচা-পাকা দাড়ি, পাঁচ-সাতদিনে একবার কামাতেন বোধ হয়। আর হাটের দিনে দেখতুম—দড়িতে বাঁধা একটা ছোট্ট মাছ আর একটা ছোট্ট লাউ কি কুমড়ো কিনে মাথা নামিয়ে টুকটুক করে হেঁটে যাচ্ছেন বাসার দিকে।

এই প্রবোধবাবুর অসুখ। দেখবার কেউ নেই তা-ও শুনেছি। তা হলে নিশ্চয় সুমন্তদা গেছে তাঁর ওখানেই। ওর পক্ষে এটাই স্বাভাবিক।

প্রবোধবাবুর বাসা গঞ্জ থেকে একটু একটেরেয়। একটা পুরনো অন্ধকার আমবাগান পেরিয়ে তাঁর বাসা। মাটির দেওয়াল, টালীর চাল। দূর থেকে বাসাটা আমি দেখেছি, আর দেখেছি তার মাটির দেওয়ালের নীচের দিকের অনেকটা জায়গায় গোল করে নতুন মাটি লেপা। এক সময় বড় একটা সিঁদ কেটেছিল ওখানে।

যেতে যেতে আমার ভয় করতে লাগল। কী তিথি ছিল জানি না—আকাশে চাঁদ নেই। আমবাগানটায় থমথম করছে অন্ধকার।

এদিকে একটা ডোবার পাশে দু-তিনটি কুলগাছে ঝকঝক করছিল জোনাকি।

মাথার ওপর দিয়ে বাদুড় যাচ্ছিল। নির্জন জায়গাটা—আমবাগানের দিকে তাকিয়ে বুক কাঁপছিল আমার। আমি কাঠ পাতা সিঁড়ি বেয়ে মেটে দাওয়ায় উঠলুম। সামনে ভেজানো কপাট। ভেতর থেকে আবছা আলোর সরু রেখা একটা দরজার জোড়ের ফাঁক দিয়ে এসে পড়েছে বারান্দায়। কোনো সাড়া শব্দ নেই কোথাও। শুধু মনে হল, ভেতরে কে যেন জড়ানো গলায় বিড় বিড় করে কথা বলছে।

কী করব বুঝতে না পেরে দাঁড়িয়ে রইলুম একটু। তারপর আল্‌তোভাবে দু-তিনটে টোকা দিলুম দরজায়।

'কে ?'—চমকে উঠে কে যেন সাড়া দিলে ভেতর থেকে। ঠিকই আন্দাজ করেছি আমি। সুমন্তদার গলা। এখানেই রয়েছে সে।

'আমি মণ্টু।'

'মণ্টু!'—সুমন্তদার স্বর আর একবার চমকালো: 'তুই এখানে ?'

দরজাটা খুলে গেল। ঘরের ভেতরে লণ্ঠনের লাল আলো—সুমন্তদা পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়েছে, আমি তার মুখ দেখতে পাচ্ছিলুম না। একটা অচেনা ছায়া মূর্তির মতো মনে হল তাকে।

সুমন্তদা ফিসফিস করে বললে, 'মণ্টু, তুই এখানে কেন ?'

'বা-রে, বাড়িতে যে শনিসেবা। মা খুঁজছিল তোমাকে।'

'আমি যে এখানে তা কী করে জানলি ?'

'ডাক্তারখানায় গিয়েছিলুম—সেখানে কাউকে দেখলুম না। তখন মনে পড়ল, আপনি বলেছিলেন প্রবোধবাবুর খুব বেশি অসুখ, দেখবার কেউ নেই, তাই আমি ভাবলুম, আপনি হয়তো—'

কথাটা শেষ পর্যন্ত শুনল না সুমন্তদা—মাঝখানেই বাধা দিলে। গলাটা কাঁপতে লাগল তার।

'হাঁ রে, সত্যিই খুব বেশি অসুখ। বুঝলি, লোকটা বাঁচবে না।'

বলার ভঙ্গিতে ধ্বক্‌ করে উঠল আমার বুকের মধ্যে।

সুমন্তদা বললে, 'তুই এসেছিস, খুব ভালো হয়েছে। আমি ভারী মুস্কিলে পড়েছি—বুঝলি? লোকটার বিছানার পাশে এখন আমি ছাড়া কেউ নেই। ইউনিয়ন বোর্ডের যে দুটো পিয়ন রাত জাগে পালা করে, তারা আসবে খেয়ে-দেয়ে, রাত ন'টা-সাড়ে ন'টায়। অথচ, আমার একদম ভালো লাগছে না রে। লোকটা যেন কি রকম করছে। একবার ডাক্তার দেখানো দরকার। অথচ আমাদের ডাক্তারবাবু কোথায় দূরে কলে গেছে, কখন আসবে ঠিক নেই। এখন হবিব ডাক্তারকে ডেকে আনা যায়—সেও তো অনেক দূরে। প্রবোধবাবুর একটা পুরনো সাইকেল আছে, নিয়ে যেতে পারবি তুই?'

'কিন্তু হবিব ডাক্তার কোথায় থাকে আমি তো জানি না সুমন্তদা।'

'হুঁ। হবিব ডাক্তার থাকে বন্দর ছাড়িয়ে আর একটু দূরে, কাজীপাড়ায়। তোর খুঁজে পেতে অসুবিধে হবে, তা ছাড়া এই পুরনো সাইকেল দিয়ে এত রাতে অত দূরেও পাঠাতে পারি না তোকে। অথচ লোকটাকে একলা ফেলে—' একবার থামল সুমন্তদা: 'একটু বসতে পারবি মন্টু রোগীর কাছে? আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসব।'

গায়ের ভেতরে আমার শিরশির করে উঠল: 'কেন পারব না? তবে দেরী হলে মা—'

'খুড়িমা সব বুঝবেন। বেশি তো নয়, আধঘণ্টা। তুই যাতে বকুনি না খাস, সে আমি দেখব।'

'আচ্ছা।'

'তবে আয় ভেতরে।'

প্রবোধবাবুর ঘরটা আমি বাইরে থেকে দেখেছি, ভেতরে ঢুকিনি। আজ পা দিতেই যেন অন্তরাত্মা চমকে উঠল। মাথার কাছে একটা টুলের ওপর চিমনিতে কাগজের পটি আঁটা লণ্ঠন—তার মাথাটা আবার ভাঙা হু-হু করে ধোঁয়া উঠছে সেখান দিয়ে।

আর একটা টুলের ওপর একরাশ ওষুধের শিশি, জলের গ্লাস, একটি পেয়ালা। হাতলভাঙা একটা কাঠের চেয়ার টানা রয়েছে বিছানার পাশে, তার ওপর একটা তালপাতার পাখা—ওই চেয়ারে বসে বোধ হয় রোগীর মাথায় হাওয়া করছিল সুমন্তদা। ঘরের আর একটা দিক প্রায় অন্ধকার, সেখানে দু-একটা বাক্স-টাক্স কী দেখা যায়—একটা দড়িতে কতগুলো কাপড়-জামা—তার ওপরে খোলা জানলা দিয়ে ভূতুড়ে আম-বাগানটার চেহারা। অসুখ আর ওষুধের গন্ধভরা অদ্ভুত দমচাপা আবহাওয়া একটা—মাথার ওপর তালকাঠের আড়াগুলো যেন হাত বাড়িয়েই ছোঁয়া যায়।

কিন্তু তারও চাইতে অস্বস্তিকর রোগীর চেহারা।

মুখ ভরে গেছে কাঁচা-পাকা দাড়িতে। আরো তুবড়ে গেছে ভাঙা গাল দুটো। বুক থেকে গলা পর্যন্ত কাঁপিয়ে বড় বড় নিশ্বাসের ঢেউ উঠছে।

এই ঘর—এই সব গন্ধ, ভাঙা লণ্ঠনের লাল আলোয় ঘরময় ছায়ার নাচানাচি—আমার প্রথমেই মনে হল এক ছুটে পালিয়ে যাই এখান থেকে। কিন্তু আমি নড়তে পারলুম না।

সুমন্তদা বললে, 'ওই শ্বাসটাই আমার ভালো ঠেকছে না, মণ্টু। ওটা—' একটু থেমে বললে, 'তুই একটু বোস ওই চেয়ারটায়, পাখাটা নিয়ে বাতাস কর। আমি সাইকেলটা নিয়ে দৌড়ে আসব। যদি আমাদের ডাক্তারবাবু ফিরে থাকেন, তা হলে তো এক্ষুণি আসছি। আর হবিব ডাক্তারকে আনতে হলে—আধঘণ্টা। বসতে পারবি না?'

পারব না বললেই বাঁচা যেত। বলা গেল না।

সুমন্তদা বললে, 'তুই ছেলেমানুষ, তোর একটু ভয় করতেই পারে। কিন্তু ভয়ের কী আছে রে? মনে রাখিস বীরবাণী, মনে রাখিস, মায়ের সেবক কাউকে ভয় পায় না। আচ্ছা—আমি চললুম, আর সময় নেই।'

পুরোনো সাইকেলটা বোধ হয় বারান্দায় রাখা ছিল, আমি

দেখি নি। সুমন্তদা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। সাইকেলটা নিয়ে রাস্তায় নামল, চলে গেল—সে আওয়াজও পেলুম।

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, এখন আমি একা। তেরো বছর বয়েসে একা রোগীর ঘরে। খোলা জানলাটা দিয়ে অন্ধকার আমবাগানের হাওয়া আসছিল, লণ্ঠনের শিখা লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছিল সে হাওয়ায়, ঘরময় যেন কতগুলো অশরীরীর নাচ চলছিল। তালকাঠের আড়াগুলো যেন চেপে ধরছিল মাথার ওপর। আর অসুখের গন্ধ, ওষুধের গন্ধ, মাটির ঘরের গন্ধ, রোগীর ময়লা বিছানার গন্ধ। দম আটকে আসছিল যেন।

আর বিছানার ওপর রোগী চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। মুখভরা খোঁচা খোঁচা দাড়ি, তোবড়ানো গাল দুটো বসে গেছে আরো। নিশ্বাসের ঢেউ উঠে পেট থেকে গলা পর্যন্ত দুলিয়ে দিচ্ছে—থেকে থেকে একটু-একটু হাঁ হয়ে যাচ্ছে মুখটা।

সেদিকে আমি চাইতে পারলুম না। মাথাটা সামনের দেওয়ালের দিকে ফিরিয়ে—ছায়ার নাচ দেখতে দেখতে প্রাণপণে হাওয়া করে যেতে লাগলুম হাতপাখাটা দিয়ে।

কতক্ষণ কেটেছে, জানি না। ডান হাত ধরে গেলে পাখাটা বদলে নিচ্ছি বাঁ হাতে। এমন সময় শাঁ-শাঁ করে চাপা গলায় কে বললে, 'এই—এই শুনছিস ?'

ভয়ানক চমকে আমি চেয়ে দেখলুম। চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন প্রবোধবাবু। কিন্তু কী ভয়ঙ্কর সেই চোখ! যেন রক্তে ছোপানো। হাওয়ার কাঁপন লাগা লণ্ঠনের লাল আলোয় সেই চোখ দেখবামাত্র অন্তরাত্মা একেবারে শুকিয়ে গেল আমার।

চোখ দুটো মেলে আছেন আমার দিকেই, অথচ আমাকে দেখছেন না। সেই রক্তমাখা চোখের তারা যেন ঘরের আড়ায়—ছায়ানাচা কোণে কোণে ঘুরে ঘুরে কী খুঁজছে।

'এই—শুনতে পাচ্ছিস, এই ?'

বড় বড় নিঃশ্বাসের সঙ্গে চাপা গলার কাঁপা-কাঁপা ডাক যেন

দূর-দূরান্ত থেকে আসতে লাগল আমার কাছে : 'তাড়িয়ে দে— তাড়িয়ে দে। তক্তার তলায় দুটো বড় বড় শেয়াল ঢুকল—দেখছিস না? তাড়িয়ে দে শীগ্‌গির—'

আতঙ্কে সিঁটিয়ে গিয়ে আমি ক্ষীণস্বরে বললুম, 'কই—কোথায় শেয়াল?'

'আছে! আছে শেয়াল। কে ঘুরছে চালের ওপর দিয়ে—কে? কারা ওখানে? এই খোল্ দরজাটা, এক্ষুণি খোল্—বাইরে কারা সব দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখছিস না? খুলে দে—খুলে দে দরজা—'

সেই বয়সেও আমি জানতুম ও ডিলিরিয়ম—অসুস্থ মনের প্রলাপ। কিন্তু বাইরে জংলা আমের বাগানটায় হাওয়া দিয়েছিল, শাঁ শাঁ করে শব্দ আসছিল তার—খোলা জানলা দিয়ে মনে হচ্ছিল অসংখ্য কালো কালো ছায়া জড়ো হয়েছে সেখানে; চারদিকের সেই কুৎসিত নির্জনতার মধ্যে অনেকগুলো অদৃশ্য প্রাণীর পদসঞ্চার চলছে, তারা শেয়ালের মতো দেখতে—অথচ শেয়াল নয়; আমি টের পাচ্ছিলুম দরজার বাইরে কখন নিঃশব্দে জড়ো হয়েছে অনেকে, একবার খোলা পেলেই তারা এই ঘরের ভেতরে চলে আসবে।

'আসতে দে—আসতে দে ওদের—' শ্বাসের টানটা ঘড় ঘড় করতে লাগল গলায় : 'দরজা খুলে দে। কে—কে চলে বেড়াচ্ছে চালের ওপর? ওরা কারা?'

অমানুষিক ভয়ে আমার সব অনুভূতিগুলো লোপ পেয়ে গেল। হাত থেকে কখন ঠক করে নীচে খসে পড়ল তালপাতার পাখাটা, আমি টেরও পেলুম না।

রক্তমাখা চোখ দুটো বুঁজে গেল আবার। বড় হতে লাগল মুখের হাঁ-টা। আরো কিছু বলছিলেন হয়তো, কিন্তু সব মিলিয়ে গেল গলার ঘড়ঘড়ানির ভেতরে। তারপর সেই আওয়াজটা বাড়তে লাগল, আরো বেড়ে চলল—যেন সমস্ত ঘরটাকে ভরে দিলে। তারও পরে—

প্রকাণ্ড একটা নিশ্বাসের ঢেউয়ে সারা শরীর দুলে উঠল প্রবোধবাবুর—মরা মাছের মতো হাঁ হয়ে গেল মুখটা, মাথাটা বালিশের একদিকে কাত হয়ে গেল। একটা হাতে মুঠো করে ধরেছিলেন বিছানার চাদর, ধীরে ধীরে মুঠোটা খুলে ছড়িয়ে পড়ল আঙুলগুলো।

তারপর সব শান্ত।

বাইরে কখন দুটো সাইকেলের শব্দ উঠেছে টেরও পাই নি। দরজাটা খুলে যেতে আমি বিহ্বল চোখে সেদিকে তাকালুম। সব ছায়া-ছায়া লাগছিল, তবু চেতনার শেষ কেন্দ্রে পৌঁছে আমি বুঝতে পারলুম পাকা দাড়িওয়ালা লম্বা ফর্সা মানুষটি হবিব ডাক্তার, তাঁর পেছনে সুমন্তদা।

'কেমন আছেন উনি—' বলতে গিয়েই সুমন্তদা থমকালো: 'একি!'

স্বপ্নের মধ্যে হবিব ডাক্তারের গলা শুনতে পেলুম: 'কেন আর আমাকে খামোখা ডেকে আনলে হে? দেখবার তো আর কিছু নেই—হি ইজ্ ডেড।'

ওইটুকুই বাকী ছিল আমার। কখন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলুম মনে নেই, এবার আমি সোজা টলে পড়ে গেলুম মাটিতে।

পৃথিবী মুছে গেল।

সেই আমার প্রথম দেখা—মৃত্যুর সঙ্গে।

॥ ছয় ॥

সামনে একটানা সমুদ্রের শব্দ। প্রবোধ মণ্ডলের শ্বাস টানার কথা মনে পড়ে গেল।

তারপরে তো কত মৃত্যু এল গেল। সুমন্তদা বুড়ো হয়ে গেছেন, আমি কবে পার হয়ে গেছি যৌবনের সীমা। আর এই বেঁচে থাকার দিনগুলো যত বেড়ে চলে, ততই তো মৃত্যুর সঙ্গে দেখা হতে থাকে বার বার। আত্মজনেরা চলে যায়, বন্ধুরা হারায়, কতবার শ্মশানে যাই, কত চিতার আগুনে দেখি মরণ-মহেশ্বরের আরতি চলছে।

সুমন্তদা এই জীবনের সব কিছু আমায় চিনিয়ে দিয়েছিল বুঝি। মৃত্যুকেও। আমি এখনো চোখ বুজলে সেই কেরোসিনের লাল আলোর ছায়ানাচা ঘরটাকে দেখতে পাই—সেই আতঙ্ক এখনো চমক দিয়ে ওঠে বুকের ভেতর, এখনো আমার কানের কাছে সেই টানা-টানা শ্বাসের স্বর আসে: 'খাটের নীচে ছুটো শেয়াল ঢুকেছে, দেখছিস না? তাড়িয়ে দে—তাড়িয়ে দে।'

আজ জানি, প্রবোধ মণ্ডল মারা গিয়েছিলেন মেনিনজাইটিসে।

সমুদ্রের ওপর রোদটা যেন নীল হয়ে জ্বলছে। এখনো ফিরছে জেলেদের নৌকো। চকচকে মাছে ভরা ওদের জাল। সমুদ্রে ওরা ইলিশ মাছও ধরে নিশ্চয়। কিন্তু সে মাছের স্বাদ ভালো নয়, পুরীতে খেয়ে দেখেছি।

ইলিশ মাছ!

স্মৃতিতে আবার ছবি পড়ল।

উত্তর বাংলার সেই দূরের গ্রাম—যেখান থেকে অন্তত মাইল ত্রিশেক না গেলে ছোট একটা রেল স্টেশনেরও দেখা পাওয়া যায় না—সেখানে ইলিশ মাছ ছিল আমাদের কাছে স্বপ্ন। আমার আবছা মনে পড়ে আমাদের ঘরের দেওয়ালে কৃষ্ণনগরের তৈরি

মাটির ইলিশ ঝুলত একজোড়া। খুব সম্ভব বরিশালের মানুষ বাবা ওই মাছ দুটোর দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুখী হতেন।

কালে-ভদ্রে হাঁড়িতে করে কোথা থেকে আসত য়েন নোনা ইলিশ। আর তাতেই বাড়িতে উৎসব পড়ে যেত।

সুমন্তদা একদিন বললে, 'নোনা ইলিশ! ধেৎ! দেশে আবার লোকে খায় নাকি ওগুলো?

মা বললেন, 'কী করা যাবে, এই তো পাওয়া যায়না এখানে।'

সুমন্তদা বললে, 'বোগাস—বোগাস জায়গা। এত দেশ থাকতে কেন যে কাকামণি চাকরি নিয়ে এল এখানে! ইলিস মাছের জন্য আপনার মন কাঁদে না খুড়িমা?'

মা মুচকে হেসে বললেন, 'বিশেষ না।'

'সেকি কথা! বরিশালের মেয়ে হয়ে—'

মা তেমনি হাসতে লাগলেন: 'না, বাবা আমি চব্বিশ পরগণার মেয়ে। নৈকষ্য কুলীন খুঁজতে গিয়ে আমার বাবা আমাকে তোমাদের বাঙাল দেশে চালান করেছেন। আর তখন তোমার কাকামণি কেবল চাকরিতে ঢুকে বসিরহাটে পোস্টেড হয়েছেন—নইলে বাঙালের ঘরে আসবার কপাল আমার হত না।'

'হোপলেস খুড়িমা, একেবারে হোপলেস। আপনি ইলিশের মর্ম কী বুঝবেন?'

জবাব না দিয়ে মা রান্নাঘরে চলে গেলেন। নোনা ইলিশ রান্নার ঝঞ্ঝাট অনেক—হিন্দুস্থানী ঠাকুর পেরে উঠবে না।

সুমন্তদা দাওয়ায় পা ছড়িয়ে গান ধরল: 'ও আমার ইলিশা রে—'

দীপু খিলখিল করে হেসে উঠল: 'এ আবার কী গান।'

'ভাগ্। পুঁচকে ফাজিল কোথাকার।'

ইল্‌শা মাছে উড়িয়া বলে আমার বড় ঘেড়ি,
আমার লাইগ্যা সাজিয়া রইছে উজীরপুরের বড়ি—
ও আমার ইলিশা রে—'

আমি হাঁ করে চেয়ে রইলুম। সুমন্তদা বললে, 'কি রকম লাগল ?'

'কিছু বুঝতে পারলুম না।'

'নাঃ, তোর মাথায় সত্যিই কিছু নেই। জালে ইলিশ মাছ উঠল। উঠে কী বললে ? আমার বড় ঘেডি—অর্থাৎ আমার ঘাড়টা খুব মোটা। আমাকে কে কাটবে ? না—আমার জন্যে উজীরপুরের বডি—'

আমি বললুম, 'বডি তো ইংরিজি। বডি মানে শরীর।'

'তোর মুণ্ড। বডি মানে বঁটি, বরিশালে ওই রকম বলে। ইলিশ মাছ বললে, 'আমাকে কাটবার জন্যে উজীরপুরের বঁটি তৈরি হয়ে রয়েছে।'

'উজীরপুর! সে কোথায় ?'

'আমার গ্রাম থেকে বেরিয়ে প্রথম গেলি মাহিলাড়া। সেখান থেকে গেলি বাটাজোড়—হুঁ-হুঁ—অশ্বিনী দত্তের গ্রাম। সেখান থেকে শিকারপুর—যেখানে তারাবাড়ি আছে—একান্ন পীঠের এক পীঠ। শিকারপুর থেকে শোলোক—শোলোক পার হয়ে—'

বরিশালের ভূগোল শুনতে শুনতে মাথা ধরে গেল।

'উজিরপুরের কথা বলুন সুমন্তদা।'

'আরে তারপরেই তো উজিরপুর। আমার মেজ পিসিমার বাড়িই তো সেখানে। বুঝলি সেখানকার দা-বঁটি, তার তুলনাই হয় না। উজিরপুরের বঁটি আর ইলিশ মাছ—ব্যস, আর দেখতে হবে না।

'আমার ইলিশা রে—'

একটু চুপ করে থাকল সুমন্তদা। তারপর বললে, 'আমি তো সব ছেড়েই এসেছি, আমার আর মায়ার বন্ধন বলতে কী-ই বা আছে! তবু কখনো কখনো ইচ্ছে করে দেশে যাই।'

আবার চুপ করল। দিনটা মেঘলা, আকাশ অন্ধকার। থেকে থেকে বৃষ্টি চলছে সমানে। আমাদের বাড়ির সামনের গাছটা থেকে

কদমফুলগুলো ঝরে ঝরে পড়ছে জলে-কাদায়। বাগান থেকে যুঁইয়ের গন্ধ, কামিনীর গন্ধ। ভরা বর্ষায় খ্যাপা নদী আত্রাই ছুটেছে ঘোলা জলের ঘূর্ণি ঘুরিয়ে। সাঁতার শিখেও সে নদীতে এখন নামবার কথা ভাবতে পারি না আমি, সুমন্তদাও না। জল অসম্ভব বেড়েছে, খেয়া বন্ধ। আমি আশায় আশায় মধ্যে মধ্যে তাকাচ্ছি ধোঁয়ার মতো মেঘ উড়ে যাওয়া আকাশের দিকে—বৃষ্টিটা একটু চেপে নামলেই আজ স্কুলে নির্ঘাত রেনি-ডে। কয়েকটা ছোট-বড়ো ব্যাং এসে লাফালাফি করছে উঠোনে, দীপু একটা কাঠি দিয়ে তাদের খোঁচা-খুঁচি করছে আর রান্নাঘর থেকে মা দীপুকে বকছেন।

আত্রাইয়ের সেই একটানা ডাক কিছুক্ষণ কান পেতে শুনল সুমন্তদা। একটা নিশ্বাস ফেলল।

এই তো ইলিশের সময়—বুঝলি। মেঘের ডাকে নেচে ওঠে মাছের ঝাঁক, উলসে ওঠে জলের ওপর। প্রকাণ্ড নদীতে কোথাও এখন বেড়াজাল পড়েছে—কোথাও দল বেঁধে বেরিয়েছে জেলেডিঙি। জেলের পায়ে জালের দড়ি জড়ানো, হাতে বৈঠা। জালের দড়িতে যেই টান পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে বৈঠা রেখে তুলে আনল জাল—কী বড়ো বড়ো ইলিশ ছটফট করছে জালে—নীলচে-রুপোলি রঙ কতদূর থেকেও ঝিকমিক করে উঠল। নালা দিয়ে পর্যন্ত ছুটেছে বর্ষার জল—রাত্তিরে তাতে চারো পেতে সকালে তুলে নে—মাছে ভরে গেছে, ছটাছট করে লাফাচ্ছে চিংড়িগুলো—

আমি কান পেতে রূপকথা শুনতে লাগলুম।

সুমন্তদা উদাস চোখে চেয়ে রইল আকাশের দিকে। তারপর ঃ

'তোর দেশে যেতে ইচ্ছে করে না মণ্টু ?'

'করে।'

'কখনো তো দেশ দেখিস নি ?'

'না।'

'যাবি ?'

'কী করে যাব? বাবা যদি কখনো নিয়ে যায়, তবে তো? বাবার তো সময়ই হয় না।'

'আমি যদি যাই, আমার সঙ্গে যাবি? নিজের বাড়ি দেখলি না, ঘর দেখলি না, বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে পূজো দেখলি না, শ্রাবণ মাসে তোদের মনসা বাড়িতে রয়ানী শুনলি না, কোনো মানে হয়? চল্ এবার পূজোয়, মাসখানেক কাটিয়ে আসবি দেশে।'

আমার চোখে আরো নিবিড় হল স্বপ্ন। আমি কাতর হয়ে বললুম, 'আপনি বলবেন বাবাকে? তা হলে নিশ্চয় যেতে দেবেন আপনার সঙ্গে।'

মেঘলা আকাশ, হু-হু করে হাওয়া—গাছপালার মাতামাতি—বাগান থেকে ফুলের গন্ধ—আত্রাইয়ের ডাক। বাড়ির সজনে—পেঁপে-পেয়ারা গাছে খ্যাপামি জাগিয়ে ঝমঝমানি বেজে উঠল রান্নাঘরের টিনের চালে। ঝেঁপে বৃষ্টি নামল। আজ স্কুলে নির্ঘাত রেনি-ডে।

সুমন্তদা উঠে পড়ল দাওয়া থেকে—বৃষ্টির ছাট আসছিল। যেন ঘোর কেটে গেল তার।

'না রে, এখন দেশে যাওয়া যাবে না। পূজোর সময়ও না।'

দীপু বারান্দায় উঠে সমানে চ্যাচাচ্ছিল: 'আয় বৃষ্টি ঝেঁপে, ধান দেব মেপে।'

আমি ধমক দিয়ে বললুম, 'উঃ, থাম না। কেন দেশে যাবেন না সুমন্তদা?'

দীপু একটা ঘোড়ায় বসে পা দোলাতে শুরু করল: 'আয়-রে আয় ছেলের দল, মাছ ধরতে যাই।'

তার দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে সুমন্তদা বললে, 'বুঝতে পারছিস না?'

'না তো।'

'সেই মা। আর কে?'

'কোন্ মা'—রান্নাঘর থেকে বৃষ্টির গন্ধ ছাপিয়েও নোনা ইলিশ

ভাজার সুসংবাদ আসছিল, আমি একটুখানি অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলুম তাতে।

'কোন্ মা?' সুমন্তদা দাঁত খিঁচিয়ে উঠল: 'মা আবার ক'টা থাকে? তোকে বলি নি এর আগে? তোর এত মাথা মোটা যে কিচ্ছু মনে থাকে না। বললুম না যে মা আমাকে কেবল বন্ধনে জড়াতে চায়?'

'ও—বন্ধন।'

শব্দটা আমার পক্ষে একটু গুরুপাক হয়েছে বুঝে সুমন্তদা গলা নামিয়ে বললে, 'বিয়ে—বিয়ে।' তারপর আড়চোখে আবার চেয়ে দেখল দীপুর দিকে। কিন্তু সে এমন কিছুই শুনছিল না—ঘোড়ায় চুপ করে বসে বৃষ্টি পড়া দেখছিল এক মনে।

আমি বললুম, 'হ্যাঁ—হ্যাঁ—বিয়ে।'

'আঃ—আস্তে আস্তে। চ্যাচাস কেন গাধার মতো? মা আবার সেদিনও একটা চিঠি লিখেছে—তাতে খালি প্যান্‌পেনে কান্না। বাবা, তুমি বিবাহ করো, এখানেই চাকরির একটা ব্যবস্থা হইবে, বুড়া বয়সে আমারও তো নাতি-পুতি—'বলতে বলতে সুমন্তদা থেমে গেল: মানে অনেক সব খারাপ কথা লিখেছে, তোর শুনে আর কাজ নেই। মানে বাড়ি গেলেই আর রক্ষে নেই, সঙ্গে সঙ্গে গলায় ফাঁস পরিয়ে দেবে।

দারুণভাবে বিদ্যুৎ চমকালো, তার পরেই ভয়ঙ্কর এক মেঘের ডাক। তার রেশ থেমে গেলে সুমন্তদা বললে, 'লোকের মা হয় করুণাময়ী—জননী। আর আমার মা—দেখছিস তো?'

কিছুই দেখছি না। তবু বললুম, 'হুঁ।'

'এইভাবে নিষ্ঠুরের মতো সন্তানকে বেঁধে রেখে—'

আমার এতদিনে কিছু বয়েস বেড়েছে, প্রতিবাদ করে বললুম, 'কিন্তু ছেলে সন্ন্যাসী হলে কোন্ মা'র ভালো লাগে?'

'খুব তো বক্তিয়ার হয়েছিস দেখছি!'—কটমট করে আমার মুখের দিকে তাকালো সুমন্তদা: 'কিন্তু সবাই যদি স্বার্থপর হয়,

ছেলের কথা কেউ না ভাবে, নর নারায়ণের সেবার দায়িত্ব না নেয়, তা হলে কেমন করে গড়ে উঠবে স্বামীজীর ভারত ? কেন তা হলে মুকুন্দ দাস ডাক দিয়ে বললেন—'বান এসেছে মরা গাঙে, খুলতে হবে নাও, তোমরা এখনো ঘুমোও ?'

আমি বললুম, 'তা বটে।'

'নিজের চোখেই তো প্রবোধবাবুকে মরতে দেখলি—দেখিস নি ? তুই আবার তাইতে অবাক হয়ে গেলি—তখন তোকে নিয়ে আরেক কাণ্ড। কিন্তু ভেবে ছাখ—শেষ মুহূর্তে এই মানুষটার সেবা করতে পারাও—'

সেই শনিবারের রাতটা মনে পড়তেই সেবাব্রত, স্বামীজীর বাণী —সব মুছে গেল আমার মন থেকে। চোখের সামনে নিদারুণ দুঃস্বপ্নের মতো ভেসে উঠল সবটা।

বলে ফেললুম, 'ওরে বাবা !'

'ওরে বাবা ?'—সুমন্তদা চটে গেল : 'এতদিন ধরে এই শিক্ষেই দিচ্ছি তোকে ? "কাপুরুষ—ভয়ের আধার।" আজকাল পদ্য মেলাবার চেষ্টা করিস দেখতে পাই, ওই মিনমিনে কবিতাই লিখবি তুই এরপর। তোর আর কিছু হবে না।'

দুমদাম করে চলে গেল নিজের ঘরে। একটু পরেই শুনলুম তার গলা উঠছে পর্দায় পর্দায় :

Sanyesin bold—say, om—Tat Satom.

অকাশভাঙ্গা বৃষ্টি—উঠোনে জল জমেছে, বৃষ্টির বড়ো বড়ো ফোঁটা টগবগ করছে তার ভেতরে, কয়েকটা ছোট ছোট ব্যাং সিঁড়ি বেয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে আসতে চাইছে বারান্দায়। তারই ভেতরে রান্নাঘর থেকে নোনা ইলিশ ভাজার গন্ধ। আমি আর সুমন্তদার কথা ভাবছিলুম না, আমার মনে হচ্ছিল—আজ নিশ্চয় রেনি-ডে।

লনের ইউক্যালিপ্‌টাস্ আর সামনের নীলম্ রোড ছাড়িয়ে আমার সামনে সমুদ্র আর সমুদ্র। কী নীল, কী নীল তার রঙ,

এত নীল দীঘায় নেই, বালেশ্বরে নেই, পুরীতেও না। এই নীলে অনিঃশেষ আকাশ, অতলান্ত সাগর। জীবনের কোনো ডানাই কুলিয়ে উঠতে পারে না তাকে, কোনো অবগাহনে তার তল মেলে না। না।

তা না হলে এস কে ঘোষম্? ঘড়ির দোকান? এই কি তৎ সৎ ওম্? এই কি 'উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রতঃ প্রাপ্য বরান্ নিবোধতঃ?' 'ওঠো, জাগো—বরেণ্য জনকে প্রশ্ন করে সত্যকে অধিগত হও?'

কোনো বরেণ্য কি এই ভাবেই নিবোধিত করেছিলেন সুমন্তদাকে? কিন্তু ঘড়ির দোকানের সঙ্গে আমি কোথাও তো বীরবাণী কিংবা মুকুন্দ দাসের মিল খুঁজে পাচ্ছি না। 'ওয়াচ মেকার্স অ্যাণ্ড রিপেয়ারার্স'—এর মধ্যে কোথাও তো সন্ন্যাসের কোনো ইঙ্গিত আছে বলে জানি না আমি।

এই নীল—নীল-নীল সমুদ্রের মতো, আকাশের মতো জীবন। তাকে খুঁজতে গিয়ে ডানা নিমেষে ক্লান্ত—অবগাহন হাস্যকর। সুমন্তদা কেমন করে এস কে ঘোষম্ হয়ে যায়, কে বলবে!

কিন্তু হঠাৎ সেই বর্ষার দিনটার কথাই আমার মনে পড়ল কেন? কোন্ অনুষঙ্গে?

বুঝেছি। কল্যাণীদি।

সেদিনও ঝিরঝির করে বৃষ্টি। কিন্তু সকাল নয়—বিকেল। স্কুল থেকে ফিরে আর মাঠে যাওয়া হল না। বাবা বাড়িতে নেই, এ সময় তিনি থাকেন না। সুমন্তদা আমাকে বলছিল, 'কাকামণিকে বলে তোর জন্যে ডাম্বেল আনাব—রোজ কষলে তোর রিস্টে জোর আসবে, দীপু পুতুল খেলছিল এক কোণায়। এই সময় মা আমাদের জন্যে চিঁড়ে ভাজা আর ফুলুরি নিয়ে এলেন।

দারুণ খুশি হয়ে সুমন্তদা বললে, 'খুড়িমা ঘটি হয়ে এইটেই সুবিধে, বুঝলি?'

'কী সুবিধে?'

'এই ফুলুরি—আলুর চপ-টপ। আমাদের দেশের মেয়েরা এ রকম করে এ সব ভাজতেই জানে না।'

আমরা চিঁড়ে আর ফুলুরিতে মন দিয়েছি, তখন গানটা এল। বৃষ্টির ঝিরঝিরানি ছাপিয়ে।

বাদল-বাউল বাজায়-বাজায়-বাজায় রে
বাজায় রে একতারা—'

দারুণ ভাবে চমকে উঠল সুমন্তদা।

'কে গাইছে রে?'

কথাটা কানে গেল দীপুর। সে-ই জবাব দিলে।

'কেন, কল্যাণীদি।'

'কে কল্যাণীদি?'

'বা রে, জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ীতে এসেছে যে আজ কদিন হল। সোনাদির মামাতো বোন। রাজসাহী থেকে এসেছে, সেখানেই ওদের দেশ কি না।'

জ্যাঠামশাই মানে আমাদের প্রতিবেশী ওভারসিয়ারবাবু হরেন সেন। সোনাদি তাঁরই মেয়ে।

'হার্মোনিয়াম বাজাতে পারে দেখছি।'

'পারেই তো।'—দীপু বললে হারমোনিয়াম সঙ্গে করেই তো এনেছে। কী ভালো গাইতে পারে কল্যাণীদি। জানেন? সোনাদিকে রোজ সন্ধ্যাবেলায় সা-রে-গা-মা শেখায়।

খবরটা আমিও জানি। কল্যাণীদিকেও দেখেছি। দু' দিন এসেছিল আমাদের বাসায়। শামলা রঙ, বড় বড় চোখ, খুব মিষ্টি করে হাসে। মা বলছিলেন, 'আহা মেয়েটার কী চুল। একেবারে কোমর ছাপিয়ে ভেঙে পড়েছে।'

সুমন্তদা এতদিন খেয়াল করে নি। সন্ধ্যার পর প্রায়ই সে বাড়িতে থাকে না—হয় ডাক্তারের পাশার আড্ডায়, নইলে আড়তদার শশীবাবুর ওখানে। তার মুখ দেখে বোঝা গেল, ভারী আশ্চর্য হয়েছে সে।

দীপু আরো কী বলতে যাচ্ছিল, সুমন্তদা থামিয়ে দিল তাকে।

'দাঁড়া—গানটা শুনতে দে।'

ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে গান আসতে লাগল :

"আমের বনে ধানের খেতে
আপন তানে আপনি মেতে
নেচে নেচে হল সারা,
বাদল-বাউল বাজায়-বাজায়-বাজায় রে—'

এ গান তো পরে আরো অনেক শুনেছি। কিন্তু আজও মনে পড়ে, সেই বর্ষার সন্ধ্যায় আশ্চর্য সুন্দর লেগেছিল গানটা। তার প্রায় প্রতিটি লাইন ধরা পড়ে গিয়েছিল আমার স্মৃতিতে :

'ঘন জটার ঘটা ঘনায় আঁধার আকাশ মাঝে,
পাতায় পাতায় টুপুর টুপুর—'

গানটা শেষ হলে একটু চুপ করে রইল সুমন্তদা। তারপর বললে, 'হুঁ, গলা মন্দ নয়। তবে তালে গোলমাল আছে!'

আমাদের ভাই-বোনের পক্ষে দুই সমান। এখানে এক যাত্রার দল ছাড়া আর কোথাও হার্মোনিয়াম দেখিনি আমি। এই গ্রামে কোন মেয়ে কখনো গান করে না। কেবল আমার ক্লাসের বন্ধু কেষ্টলালের বাড়িতে দেখেছি, খুব কম্প দিয়ে ম্যালেরিয়া জ্বর উঠলে তার ঠাকুরমা চীৎকার করে গাইতে থাকে : "মন একবার হরি বল, হরি-হরি-হরি বলে ভবসিন্ধু পারে চল—'

সুমন্তদা বললে, 'তালটাই ঠিক নেই। আরো শিখতে হবে।'

কল্যাণীদি আবার কী একটা গান ধরল—আমার ঠিক মনে নেই। বোধ হয় 'ঘন তমসাবৃত অম্বর ধরণী' গোছের কিছু একটা হবে।

'আবার কেটে গেল তাল। বললুম তো, ওইখানেই গণ্ডগোল।'

দীপু প্রতিবাদ করল। এর মধ্যেই কল্যাণীদির ভক্ত হয়ে উঠেছে সে, বোধ হয় হার্মোনিয়ামের বেলোটা দু-একবার টেনে দেবার অনুমতি পেয়েছে কিংবা তাকেও সা-রে-গা-মা শেখাবার আশ্বাস দিয়েছে

কল্যাণীদি। দীপু বললে, 'জানেন, কল্যাণীদি ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়েছে। ওর এখন বিয়ে দেবে কি না, তাই আর পড়ে নি।'

সুমন্তদা ধমকে উঠল : 'থাম্, তুই আর পাকা পাকা কথা বলিস্ নি। ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়লেই সব জানা হয়ে যায়!'

আমি একটু আশ্চর্য হলুম। আমাদের ছেলেবেলায় ক্লাস নাইনে পড়া মেয়ের বেশ সম্মান ছিল, রীতিমতো বিদুষী বলেই মনে করা হত তাকে এবং ওই পর্যন্ত উঠতেই অধিকংশ মেয়ের সতেরো-আঠারো বছর পেরিয়ে যেত—আর তার ঢের আগেই বিয়ে হয়ে যেত তাদের।

আমি বললুম, 'সুমন্তদা, তাল কাকে বলে?'

'পড়া না পারলে তোর পিঠে যা পড়ে, তাই—' একটু হেসে সুমন্তদা বললে, 'গানের সঙ্গে তবলা বাজায় দেখিস নি? তবলা দিয়ে গানের তাল ঠিক রাখতে হয়, নইলে গান খারাপ হয়ে যায়।

তবলা আর দেখব না কেন, যাত্রার আসরে তো দমাদম্ পিটতেই দেখেছি। সুমন্তদা বেশ্ গান গায় সে তো প্রথম থেকেই জানি, কিন্তু তার মধ্যে যে আবার তাল-টালও আছে এর আগে কখনো বুঝতে পারি নি। মা তাকে প্রত্যেক বিষ্যুৎবার লক্ষ্মীর পাঁচালী পড়তে দেন, বেশ সুন্দর করে সে পড়তে পারে : 'দোল পূর্ণিমার নিশা নির্মল গগন, মন্দ মন্দ বহিতেছে মলয়-পবন'—আর আমরা কলা-বাতাসার জন্যে ওৎ পেতে থাকি। কিন্তু সুমন্তদা যে এত তাল-টাল জানে—

আমি বললুম, 'আপনার গানে তাল ভুল হয় না সুমন্তদা?'

'তালে ভুল? কেন হবে?' সুমন্তদার চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল : 'আমাদের গ্রামে একজন খুব বড় ওস্তাদ আছেন, জানিস? হর্ষনাথ দাশগুপ্ত। লাল টুকটুকে পাকা আমের মতন রঙ, মাথার চুলগুলো সাদা হয়ে গেছে—আমরা তাঁকে রাঙাদাদু বলি। সারা জীবন কোলে তানপুরা নিয়েই কাটালেন। নীরব সাধক—নিজের মধ্যে ডুবে আছেন, কেউ তাঁকে জানেই না। দশ বছর বয়েস থেকেই

তাঁর সাগরেদ আমি, তিনিই তো আমায় স্বামীজীর বই পড়িয়েছেন, এ সব গান শিখিয়েছেন। তিনিই তো বলেছেন—সুমন্ত সত্যিকারের মানুষ হওয়া চাই। আরে, রাঙাদাদুই তো আমার নেশা ধরিয়ে দিয়েছেন, সেই জন্যেই তো শেষ পর্যন্ত ম্যাট্রিক দেওয়া হল না আমার। সে যাক—তাল বুঝতে চাস ? হুঁ—হুঁ—হুঁ—'

হাঁটু থাবড়ে সুমন্তদা শুরু করলেন :

ভালে চন্দ্র, বদনে চন্দ্র,
নখরে চন্দ্র, শ্রীকরে চন্দ্র,
কোটি চন্দ্র সমান জ্যোতি—'

মা ঘরে ঢুকে বললেন, 'আর ফুলুরি দেব সুমন্ত ? কী হল—সব পড়ে রয়েছে যে ?'

'ও হো হো, ভুল হয়ে গেছে খুড়িমা—' সুমন্তদা জিভ কাটল : 'এই এদের একটু তাল—'

আশ্চর্য হয়ে মা বললেন, 'তাল ?'

'মানে গানের তাল। ওই বাড়িতে যে মেয়েটি গান গাইছে, তার তালে ভুল হচ্ছিল কি না। সেই জন্যে—যাক গে, সে যাক। তা দিন খুড়িমা—আরো গরম ফুলুরিতে কোনো আপত্তি নেই আমার—'

······সমুদ্রের ওপর পাখির ঝাঁক। স্মৃতিতে ছবিগুলো ফুটে ফুটে উঠছে, মিলিয়ে যাচ্ছে, ছিঁড়ে যাচ্ছে আবার। এরই মধ্যে আর একটা বিকেল।

ফুটবল খেলে ফিরছি, সামনে কম্পাউণ্ডারবাবুর বাবা।

পালাবার রাস্তাও পাওয়া গেল না। সোজা আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেলেন তিনি।

'এই মণ্ট, কোন্ ক্লাস তোর এবার ?'

ঢোক গিলে বললুম, 'ক্লাস এইট।'

'ওঃ—তা হলে তো দিগগ্‌জ হয়ে গেছিস। বল্ দেখি এসব লাইন কে লিখেছিলেন ?

মূর্খ তুমি! মাটি কাটি লভি কোহিনুর
ফেলিয়া সে রত্ন হায়
কে ঘরে ফিরিয়া যায়—'

বললুম, 'জানি না। কিন্তু দাদু, এই ইংরিজি লাইনটা একটু বুঝিয়ে দেবেন? দি হরাইজেন্টাল এক্সপেনডিচার অব পারপেনডিকুলার কন্সটারনেশন—'

এই পর্যন্ত বলতেই দাদু মুখ ভেংচে বললেন, 'ধুৎ!' তারপরেই হাত দুলিয়ে হন-হন করে এগিয়ে চললেন।

খুব খুশি হয়ে হেসে উঠতে যাচ্ছি, হঠাৎ চমকে উঠলুম। সুমন্তদার গানের আওয়াজ। যে গান রোজ শুনি, তা নয়। হার্মোনিয়াম বাজিয়ে গলা খুলে গাইছে সুমন্তদা। এবং গাইছে ওভারসিয়ারবাবুর বাসায়!

'মুঠো মুঠো রাঙা জবা কে দিলে তোর পায়ে—'

আমি উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গেলুম বাড়িতে।

'মা—সুমন্তদা গান গাইছে ওভারসিয়ারবাবুর বাড়িতে।'

খবরটা মা-কে নতুন করে দেবার দরকার ছিল না। আমাদের বাড়ি থেকেই সে গান পরিষ্কার শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল।

মা বললেন, 'হুঁ। ও বাড়ির দিদি ডেকে নিয়ে গেছেন ওকে।'

'আমিও যাব?'

মা বললেন: 'ছিঃ। মেয়েরা ওকে গান শুনতে ডেকে নিয়ে গেছে, তুমি তার মধ্যে যাবে কেন?'—আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে খুব মিষ্টি করে বললেন, 'তুমি এখন বড় হয়েছ, তোমার আত্মসম্মান আছে। যাও—হাত-পা ধুয়ে পড়তে বোসো গে।'

দীপু বাড়িতে নেই, সে-ও সুমন্তদার সঙ্গে গেছে নিশ্চয়। আমার ওকে হিংসে হতে লাগল।

পড়তে বসলুম, কিন্তু পড়ায় মন এল না। শুনতে পেলুম, সুমন্তদা নতুন গান ধরেছে: 'তা থৈয়া তা থৈয়া নাচে ভোলা'—

॥ সাত ॥

সামনে সমুদ্রের জল। পাখিরা ঝাঁক বেঁধে উড়ছে দুপুরের রোদে। সমুদ্রের ঢেউয়ে ঢেউয়ে মৃদঙ্গ শুনছি : 'তা থৈয়া তা থৈয়া নাচে ভোলা—'

এর পর থেকে ছবিগুলোকে যেন একটা ধারার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি এখন। পর পর তারা সাজানো নেই, এখান-ওখান থেকে ঝরে পড়েছে—কিন্তু আজকের মন দিয়ে সেই ফাঁকাগুলোকে ভরে নিতে পারি আমি, যারা নেই—মিলিয়ে নিতে পারি তাদের।

হাঁ ওভারসিয়ারবাবুর বাড়িতে প্রায় নিয়মিত গানের চর্চা শুরু করল সুমন্তদা। তার তালজ্ঞানের খবর দীপুই পৌঁছে দিয়েছিল সন্দেহ নেই এবং ক্লাস নাইনে পড়া রাজসাহীর মেয়ে কল্যাণীদির অভিমানেও বোধ হয় ঘা লেগে থাকবে। তাই বোধ হয় পরীক্ষা করবার জন্যেই সুমন্তদার ডাক পড়েছিল। পরীক্ষায় সুমন্তদা যে কেবল উতরে গেল তা নয়, তার পর থেকে সে কল্যাণীদির গানের মাস্টার হয়ে উঠল।

এত সব হিন্দী গানও যে সুমন্তদার জানা আছে, তাই বা কে ভেবেছিল!

একদিন নদীর ধারে বেড়াতে বেড়াতে আমি বললুম, 'সুমন্তদা, আমাকে গান শেখাবেন?'

লক্ষ্য করেছি, সুমন্তদা আজকাল প্রায়ই অন্যমনস্ক থাকে। আমার কথার জবাব দিল না।

আমি আবার ডাকলুম, 'সুমন্তদা?'

যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে সুমন্তদা বললে, 'অ্যাঁ? কী বলছিলি?'

'আমাকে গান শিখিয়ে দেবেন?'

সুমন্তদা বললে, 'তা হলে তো একটা হার্মোনিয়াম চাই।'

'বাবাকে বলব। বাবা আনিয়ে দেবেন দিনাজপুর থেকে।

সুমন্তদা বললে, 'না—হার্মোনিয়াম আনলেও সুবিধে হবে না।'

'কেন?'

'তোর গলায় একদম গান নেই। তুই পুরোপুরি বেসুরো। হরির লুটের গানও তুই গাইতে পারিস না।'

শুনে আমি বিরক্ত হলুম।

'বা-রে, বুঝি কল্যাণীদিই একা গান শিখতে পারে?'

কোত্থেকে কী হল জানি না, হঠাৎ বিশ্রীভাবে চটে উঠল সুমন্তদা।

'বড্ড বেশি জ্যাঠা হয়ে গেছ মণ্টু। বড়দের সঙ্গে কথা বলতেও জানো না।'

আমি ভয়ঙ্কর ঘাবড়ে গেলুম। এত দিনের মধ্যে সুমন্তদার এমন রূঢ় গলা কখনো শুনিনি। অভিমানে আমি গোঁজ হয়ে রইলুম, সুমন্তদা আর একটা কথাও বলল না আমাকে।

আজকাল প্রায়ই দেখি কল্যাণীদি আসে আমাদের বাড়িতে। পিঠভরা কালো চুল ছড়িয়ে, রঙিন শাড়ি পরে। রান্নাঘরের দাওয়ায় পিঁড়ি পেতে বসে মা-র সঙ্গে গল্প করে, টানা-টানা বড় বড় চোখে তাকায়, মিষ্টি করে হাসে।

আর কল্যাণীদিকে আসতে দেখলেই উঠোনে বারান্দায় যেখানে থাকুক—সেখান থেকেই সোজা এসে ঘরে ঢুকে পড়ে সুমন্তদা। যদি আমাদের পড়াতে বসে থাকে, তা হলে বইয়ের মধ্যে আরো গুঁজে দেয় ঘাড়। যেন কল্যাণীদিকে সে চেনেই না।

একদিনের কথা মনে পড়ল। কল্যাণীদি এসেছে। মা জিজ্ঞেস করলেন, 'কদিন থেকে তো আর গান-টান শুনি না কল্যাণী।'

কল্যাণীদি বললে, 'গান আর কী করে হবে, সুমন্তদা তো যায়ই না আজকাল।'

মা বললেন, 'কি রে সুমন্ত?'

সুমন্তদা যেন কি রকম থতমত খেলো।

'ক'দিন ধরে গলায় ব্যথা হয়েছে খুড়িমা, তাই—'

'গলায় ব্যথা? আজ ভোরেও তো চিৎকার করে কালীকীর্তন ধরেছিলি বাপু। গলার ব্যথা তো কিছু বোঝা গেল না।'

কল্যাণীদি খিলখিল করে হেসে উঠল: 'হাঁ সে গান আমিও শুনেছি।'

সুমন্তদা হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো। মা-র কথার জবাব না দিয়ে, পায়ে চটি গলিয়ে চটাস চটাস করে চলে গেল বাইরে। বললে, 'তোরা পড়, আমি এক্ষুনি আসছি।'

মা বললেন, 'ও ওই রকমই। পাগলাটে।'

বড় বড় চোখ দুটো সুমন্তদার যাওয়ার দিকে তাকিয়ে একটু চুপ করে বসে রইল কল্যাণীদি। তারপর বললে, 'কাকিমা, আজ যাই।'

সুমন্তদার কী যে হল জানি না। বরাবর সন্ধ্যার পরে আমাদের একটু পড়িয়েই সে বেরিয়ে যেত, হয় ডাক্তারবাবুর ওখানে পাশা খেলতে, নইলে গিয়ে বসত আড়তদার শশীবাবুর ওখানে—যিনি খুব সৌখিন লোক অথচ গীতা আর সাধু-সন্ন্যাসীদের নিয়ে আলাপ করতে ভালোবাসেন। কিন্তু এখন দেখছি, বেরোনোই প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে। আমাদের পড়ানো হলেই সোজা চলে যায় নিজের ঘরে—পড়ে বীরবাণী, কখনো গীতা—কিংবা মাথা নামিয়ে বসে থাকে ঠাকুরের কথামৃতের ওপর।

দেখে-শুনে আমার কেমন ভয় করতে লাগল। একদিন আমি জিজ্ঞেস করতে গেলুম।

'সুমন্তদা, কথা বলব একটা?'

সুমন্তদা মাঠের একটা বকুল গাছে হেলান দিয়ে—বালুরঘাটের রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে—চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। আমাকে বোধ হয় আসতে দেখে নি, হঠাৎ চমকে উঠল। ফিরে চাইল আমার দিকে।

কিন্তু তার চাইতেও বেশি চমকালুম আমি। সুমন্তদার মুখ

ফুলো ফুলো, চোখ লাল। বুঝতে অসুবিধা হল না, এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে কাঁদছে।

সুমন্তদা কাঁদছে! এর চেয়ে অসম্ভব ব্যাপার হতে পারে কখনো? বাবার বকুনি খেয়ে কোনো সময় আমার চোখে জল এলে ধমকে বলত: 'ছি—ছি, তুই না পুরুষ মানুষ? পুরুষ কখনো কাঁদে? সে বীর, সে শক্তির সাধক। তার চোখে জল থাকে না—থাকে সংকল্পের আগুন। কী বলেছেন স্বামীজী?'

সেই সুমন্তদারই চোখে জল।

'আপনি কাঁদছেন সুমন্তদা?'

একটু চুপ করে থেকেই হেসে উঠল।

'কাঁদব কিরে? আমি কি দীপু? এই বিকেলবেলা কত সব পোকা ওড়ে, জানিস তো? তারই একটা এসে চোখে পড়েছিল। তাইতেই—'

কিন্তু কান্না আর চোখে পোকা পড়বার তফাৎ বুঝতে পারি, অন্তত সে বয়েসটা হয়েছে আমার। এই আর একটা সত্য আমি নতুন করে আবিষ্কার করলুম। সুমন্তদাও মিথ্যে কথা বলে।

বোকার মতো একটুখানি দাঁড়িয়ে থেকে আমি বললুম, 'আপনি নিশ্চয় কোনো কারণে রাগ করেছেন আমাদের ওপর।'

'ধেৎ—বোকার মতো কথা বলিস নি।'

'নিশ্চয় আপনার মন খারাপ হয়েছে।'

চোখটা কোঁচা দিয়ে মুছে ফেলে বললে, 'হাঁ—মন মাঝে মাঝে খারাপ হয় বই কি। ভালো লাগে না রে। কি রকম যেন হয়ে যাচ্ছে সব।'

'আবার বুঝি দেশ থেকে জ্যাঠাইমা বিয়ে করবার জন্যে চিঠি দিয়েছে আপনাকে?'

'না—সে-সব কিছু না।'

'কী হয়েছে তা হলে?'

'তুই বুঝবি না।'

বকুলের গন্ধে ভরা মিষ্টি বাতাসের ভেতর কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলুম দু'জনে। বেলা ডুবে গিয়ে ঘাসের ভেতরে ঝিঁঝির ডাক উঠছিল, পোকা ডাকছিল কিটির-কিটির করে—কোথায় অনেক দূরে সাঁওতালদের বাঁশি বাজছিল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সুমন্তদা বললে, 'মন্ট ?'

'অ্যাঁ ?'

'ডাকের আশায় বসে আছি, কিন্তু সে আসবে না। কোনোদিন না।'

'কেন সুমন্তদা ?'

'মনটাই ঠিক হল না। আমি তৈরি হতে পারছি না। শুধু তাই না—নিজেকে আমার চাবুক মারা দরকার।'

'সে কি সুমন্তদা !'

'আমাকে ওই পাঠক দেউলের জঙ্গলেই যেতে হবে। না—কেবল অমাবস্যার রাত্রে নয়। আমি ওখানেই পড়ে থাকব মায়ের পায়ে মাথা দিয়ে। দিনের পর দিন। দেখি, কিছু হয় কি না।'

'তা কী করে হবে ?'—আমি যতটা ভয় পেলুম, আশ্চর্য হলুম তার চাইতেও বেশি : 'জঙ্গলে থাকবেন কী করে ? সেখানে কে খেতে দেবে ?'

'খালি খাওয়া আর খাওয়া ! ওই তো শিখেছিস কেবল। যা—যা বাড়ি চলে যা এখন। আর বিরক্ত করিস নি আমাকে।'

…ছবিগুলোর মধ্যে অনেক ফাঁক। প্রত্যেকটা দিনের ভেতরই যোগসূত্র ছিল তখন, সুমন্তদা ক্রমেই যেন সুদূর আর অপরিচিত হয়ে উঠছিল আমাদের কাছে। এমন কি বাবা যিনি নিজের কাজের বাইরে বই ছাড়া কোনো কিছুর খবর রাখেন না, আর, তিনি একদিন সকালে সুমন্তদাকে ডেকে বললেন, 'তোর কী হয়েছে সুমন্ত ?'

'কিছু তো হয় নি কাকামণি ?'

'কিছু হয় নি ?'—বাবা চোখ থেকে চশমাটা নাকের নীচে

নামালেন ঃ 'তা হলে কাল মাঝ রাত্তিরে আত্রাইতে সাঁতার কাটছিলি কেন তুই ?'

মা আমাদের খাবার দিতে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন। আমি আর দীপু অবাক হয়ে চাইলুম সুমন্তদার দিকে।

মা বললেন, 'কে মাঝ রাত্তিরে সাঁতার কাটছিল আত্রাইতে ?'

'আর কে ? সুমন্ত ?'

'সে কি রে !'

সুমন্তদা মাথা নীচু করে দীপুর স্লেটে একটা অঙ্ক কষে দিচ্ছিল। তেমনি মাথা নামিয়েই বললে, 'আপনাকে কে বলেছে, কাকামণি ?'

এই তো একটু আগে বলে গেল থানার চৌকিদার। টহলে বেরিয়ে সে তোমায় নদীতে নামতে দেখেছে, সাঁতরাতে দেখেছে। রাত বোধ হয় তখন দেড়টা-দুটো হবে।'

মা বললেন, 'কী সর্বনাশ। এই ভাদ্র মাসের ভরা নদীতে !'

সুমন্তদার মাথা আরো ঝুঁকে পড়ল স্লেটের দিকে।

বাবা বললেন, 'ব্যাপারটা কী, রাত দুটোয় নদীতে স্নান করবার অভ্যেস হল কবে থেকে ?'

'না, মানে হঠাৎ বড্ড গা জ্বালা করছিল—'

'গা জ্বালা করছিল বলে নদীতে স্নান করতে হবে ? কেন— বাড়িতে ইঁদারা ছিল না ? আর হঠাৎ গায়ের জ্বালাই বা কেন ?'

সুমন্তদা জবাব দিল না।

'অসুখ-বিসুখ কিছু হয়ে থাকলে ডাক্তারকে বল। তার ওখানে তো প্রায় আড্ডা দিস।'

'না কাকামণি, ওষুধের দরকার হবে না।'

'দরকার না থাকে, খুব ভালো। কিন্তু এর পরে আর কোনো-দিন মাঝ রাত্রে ও-ভাবে নদীতে নেমো না। বর্ষার পর প্রায় প্রতি বছরই আত্রাই মানুষ নেয়। তা ছাড়া একটা কুমিরও এসেছে খবর পেয়েছি।'

মা প্রায় ডুকরে উঠলেন : 'লক্ষ্মীছাড়া ছেলে, মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি তোর?'

কী হয়েছিল সুমন্তদা-ই জানে। কতদিন অনেক রাত্রে বাইরে কদম গাছটার হাওয়ার শব্দে আমার ঘুম পাতলা হয়ে যায়, আধখানা জেগে উঠি প্যাঁচার ডাকে; শুনতে পাই বহু দূর থেকে একটা একটানা গুন গুন শব্দ—বুঝতে পারি নিজের ঘরে আলো জ্বেলে কিছু পড়ছে সুমন্তদা। হয়তো গীতা—হয়তো স্বামীজীর বই।

আর একটা দিন। ছুটির দুপুরে চলেছি ক্লাসের এক বন্ধুর বাড়িতে। লুডো খেলবার কথা আছে সেখানে।

একটা ডাক কানে এল : 'মণ্টু!'

চেয়ে দেখি, কল্যাণীদি। একটা জানলার পাশে দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে। খোলা চুলগুলো কাঁধের দু' ধার দিয়ে কোমর ছাপিয়ে নেমে এসেছে। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল কল্যাণীদিকে।

'কোথায় চললি মণ্টু?'

'কেশবদের বাড়িতে।'

'আচ্ছা যা।'

এক পা এগিয়েছি, আবার ডাক : 'মণ্টু!'

'কী কল্যাণী দি?'

'সুমন্তদা কী করছে রে?'

'ঘরে বসে পড়ছে।'

'খুব পড়ে, না? কী পড়ছে বল্ তো?'

'স্বামীজীর বই। স্বামীজী কে জানেন তো?'—আমি উৎসাহভরে বলতে লাগলুম : 'স্বামী বিবেকানন্দ। তা ছাড়া ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথামৃত। আর—'

কল্যাণীদি হাসল : 'থাক, আর বলতে হবে না, বুঝতে পেরেছি।' —একটু চুপ করে থেকে বললে, 'একটা কাজ করতে পারবি?'

'কী কাজ কল্যাণীদি?'

'সুমন্তদাকে একবার—'বলতে বলতে কী ভেবে থেমে গেল: 'আচ্ছা, কিছু বলতে হবে না। তুই যা।'

মনে পড়ে এরই দু-একদিন পরে আবার হার্মোনিয়ামের সঙ্গে সুমন্তদার গলা বেজে উঠেছিল হরেনজ্যাঠার বাসায়:

'মুঠো মুঠো রাঙা জবা কে দিলে তোর পায়—'

আর তারই সঙ্গে মিলে গিয়েছিল কল্যাণীদির গলা।

'এই শরৎ আলোর কমল বনে—'

আমার ঘোর ভাঙল।

'এই শরৎ আলোর কমল বনে
বাহির হয়ে বিহার করে যে ছিল
মোর মনে মনে—'

সামনে নীলম্ রোড, নারকেলের সারি আর সমুদ্র নয়—অনেক দূরের কলকাতা। পিসিমার দিবানিদ্রা শেষ হল বোধ হয়, ঘুম থেকে উঠে কলকাতা স্টেশন ধরেছেন। পরিচিত একটি প্রিয় মধুকণ্ঠ। গ্রামোফোন রেকর্ড।

আত্রাইয়ের ধারে ধারে কাশ ফুটেছে আবার। সন্ধ্যায়-রাত্রে মাথার ওপর দিয়ে হাঁসের ঝাঁক চলে যায় কোন্ দূরের নদীর চড়ায়, কোন্ জলায়, কোন্ পদ্মবিলের উদ্দেশে। আমাদের বাগানে দুটো গাছে শিউলির উৎসব, ভোরবেলা তার গন্ধে ভরে যায় বাড়িটা। স্কুলে পড়াতে পড়াতে কড়া মাস্টারমশাইয়েরাও অন্যমনস্ক, কবে যে ছুটি আসবে পূজোর! আস্তর পড়তে শুরু হয়েছে। নাটবারোয়ারী চণ্ডীমণ্ডপের সামনে, দেখি প্রতিমার খড়ের কাঠামোর ওপর মাটির আস্তর পড়তে শুরু হয়েছে। নাটমন্দিরটা এতদিন ছিল গোরু-ছাগলের আস্তানা, সাফ করা হচ্ছে সে সব, আনাগোনা চলছে বন্দরের সব মান্যগণ্য লোকদের।

আর—আর এবারও যাত্রা আসবে।

হাওয়ায় যখন ছুটি, যখন পূজোর গন্ধ, তখন একদিন—

সারাটা রাত ধরে খ্যাপা শ্রাবণের মাতামাতি গেল আশ্বিনের আগুনে। সকালবেলায় বাড়িতে হুলুস্থুলু কাণ্ড।

আমাদের বাড়ির কাছেই আত্রাইয়ের ধারে যে ছোট জংলা জায়গাটা—যেখানে ক'টা বাঁদর-লাঠি, পানিয়াল, জিকে, নোনা, বাবলা আর কুলগাছের জঙ্গল, সেইখানে পাওয়া গেল সুমন্তদাকে। কতগুলো বাবলার চারার ওপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে, কাঁটায় সারা গা ক্ষতবিক্ষত—কপালটা অনেকখানি ফুলে কেটে বীভৎস দৃশ্য একটা!

হৈ-চৈ পড়ে গেল। মা চেঁচিয়ে কান্না জুড়লেন। বন্দরশুদ্ধ লোক জড়ো হয়ে গেল আমাদের বাসায়।

জ্ঞান হওয়ার পর প্রশ্ন করলেন অমূল্য ডাক্তারই।

'ব্যাপার কী সুমন্ত?'

দু-হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে সুমন্তদা বললে, 'আমি জানি না।'

'জানো না? রাতের বেলা ওখানে গেলে কি জন্য? ওই বৃষ্টির ভেতরে?'

'কিচ্ছু জানি না, অমূল্যদা।'

'জানো না? তোমাকে তো হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যায় নি ওখানে। তা ছাড়া কপালেই বা ও-রকম চোট লাগল কী করে?'

'সত্যি বলছি, কিছু জানি না অমূল্যদা। মনে হল বাইরে থেকে আমায় কে ডাকছে। উঠে বেরিয়ে গেলুম। তারপরে কী যে হল—'

মা চেঁচিয়ে উঠলেন: 'নিশ্চয় নিশির ডাক। দিনরাত ধর্মের বই পড়ে, ঠাকুরের নাম করে, তাই বেঁচে গেল এ যাত্রা। নইলে—' শিউরে থেমে গিয়ে বললেন: 'হ্যাঁ রে, তিন ডাক পর্যন্ত সাড়া দিতে হয় কক্ষণো? তুই তো এত পড়িস, এই খবরটুকু জানিস নে?'

'হুঁ'—বলে ডাক্তার উঠলেন। তারপর বললেন, 'এ সব গল্পই শুনতুম, কখনো বিশ্বাস করি নি। এখন দেখছি কেউ বলতে পারে না কিসে কী হয়।

বাবাই কোনো কথা বললেন না, আগাগোড়া গম্ভীর হয়ে রইলেন।

সারা বন্দর দিন কয়েক জমাট হয়ে রইল নিশির ডাকের গল্পে। আমাদের বাড়িতে এসে একদিন স্কুলের হেড্ স্যার কি সব ইংরিজি বলতে লাগলেন, এখন সন্দেহ হয়, সেক্সপীয়রের হ্যামলেট থেকে সেই অদ্বিতীয় পংক্তি দুটি আউড়েছিলেন তিনি। আর বন্দরের সবচেয়ে শৌখিন লোক—সোনার চশমা পরা, কোঁকড়া চুলে টেরিকাটা গুড়ের আড়তদার শশীবাবু সুমন্তদাকে দেখতে এসে বলতে লাগলেন নানারকম রোমহর্ষক গল্প।

'বুঝলেন, সে হল ইটাহার থানার ওদিকে। রাত্তিরে যাচ্ছি গোরুর গাড়ি করে। রাত তখন বারোটা বেজে গেছে, একটু আগেই শেয়ালের ডাক উঠেছিল। কিন্তু হঠাৎ এক জায়গায় এসে—'

বলতে বলতে তাঁর সারা গায়ে কাঁটা দিল: 'এক জায়গায় এসে গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল। গাড়োয়ান যতই শাঁটা হাঁকড়ায়, গোরু আর নড়ে না। কেবল ফোঁস ফোঁস করে—গাড়ি ফেলে পালাতে চায়। কী বলব মশাই, ভয়ে গোরুগুলোর চোখ এই বড়ো বড়ো হয়ে গেছে যেন কী বিভীষিকা দেখছে—কারা ভয় দেখাচ্ছে ওদের! তখন কি জানি—রাস্তার ধারেই মস্ত গোরস্থান একটা, আর যারা খবর রাখে, তারা পারতপক্ষে ও রাস্তায় গাড়ি—'

রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখবার জন্য এই সবই যথেষ্ট আমাদের পক্ষে। বিছানায় শুয়ে খোলা জানলা দিয়ে তাকাবার সাহস হয় না আর, তার দরকারও হয় না, মা-ই সেটা বন্ধ করে রাখেন। আর বাইরে পাতা নড়লেই মা চমকে চমকে ওঠেন: কেউ ডাকল নাকি? খবর্দার মণ্টু, খবর্দার দীপু—তিনবার ডাকের আগে সাড়া দিবি না কিছুতেই।

বাবা একদিন বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কী আরম্ভ করলে বলো দেখি?'

মা বললেন, 'তুমি তো কিছু বিশ্বাস করো না—কিন্তু সুমন্তকে ওভাবে—'

বাবা বললেন, 'বাজে বোকো না—রাতদিন ধর্মটর্মের বই পড়ছে —মাঝরাতে চেঁচিয়ে কালীর কীর্তন গেয়ে উঠছে, মাথায়ই গোলযোগ হয়েছে ওর। অন্ধকারে বেরিয়ে গিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে এই কাণ্ড। বেকুব।'

'ছাখো—'

'থামো। ওর হালচাল আমার ভালো লাগছে না। শেষকালে পাগল হয়ে গেলে কেলেঙ্কারী একটা। আমি ভাবছি, পূজোর পরে এখানে ওকে আর রাখব না। পাঠিয়ে দেব দেশে।'

'সে কি—জ্যাঠাইমা কী ভাববেন?'

'কিছুই ভাববেন না। তিনি তো ওকে পাঠিয়ে দেবার কথা কয়েকবারই লিখেছেন আমায়।'

'কিন্তু ছেলেমেয়ে ছুটো যে ওর জন্যে পাগল। ভারী কষ্ট হবে ওদের।'

বাবা বললেন, 'বুঝি। কিন্তু আমার মনে হয়, এখানে কী একটা গোলমাল হয়েছে ওর৷ এখান থেকে চলে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। হাজার হোক পরের ছেলে। আমারও তো দায়িত্ব আছে একটা।'

মা বললেন, 'না-না, সে ভালো দেখাবে না।'

আচ্ছা, ভেবে দেখা যাবে পরে। কিন্তু তুমি এখন ওই জানলাটা খোলো দেখি। ভাপ্‌সা গরমে প্রাণ বেরিয়ে গেল।'

দীপু ঘুমিয়ে পড়েছিল, আমি কথাগুলো কান পেতে শুনেছিলুম ঘুমের ভাণ করে। সুমন্তদাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে শুনে আমার কান্না পেলো। তারপরেই মনে হল, ও শুধু কথার কথা—বাবা রাগ করে বলেছেন। সুমন্তদা আমাদের ছেড়ে কখনো যাবে না, কোনো দিন না।

আর সুমন্তদা।

একেবারে চুপ। গীতা পড়তে শুনি না, বীরবাণীও না। এমন কি ঝড়-বৃষ্টি-শীতে যা তার কোনদিন বাদ পড়ে নি, সেই এক্সার-সাইজ করাও তার বন্ধ হয়ে গেছে আজকাল। আমি বরং অভ্যাসে উঠে পড়ি—শুকতারা পশ্চিমে নেমে গেলে বিছানার ভেতরে বাবার গলা যখন গুনগুন করে ওঠে: 'অহল্যা-দ্রৌপদী-কুন্তী-তারা-মন্দোদরীস্তথা, পঞ্চকন্যা স্মরেন্নিত্যং', তখন দরজা খুলে বেরিয়ে আসি, হাত-মুখ ধুয়ে তৈরি হয়ে ডন্‌বৈঠক দিই। আর কী আশ্চর্য, তখন অঘোরে ঘুমোয় সুমন্তদা।

'বুঝলি, উঠতে হয় ব্রাহ্মমুহূর্তে। শরীর শুচি হয়, মন পবিত্র হয়ে যায়। ভগবানের নাম করবি, শরীর-চর্চা করবি। স্বামীজী কী বলেছেন? নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।'

আশ্চর্য, নিজের উপদেশ সুমন্তদা নিজেই ভুলেছে।

ভেজা মাটির গন্ধ আসে, উঠোনের পেয়ারা আর সজনে গাছ থেকে টুপটুপ করে শিশির পড়ে। ছায়া ছায়া অন্ধকার তখনো—অদ্ভুত ভালো লাগে, শিরশিরানি হাওয়া দেয়, কোনো কোনদিন ওদিকের ওভারসিয়ার বাবুর বাড়ি থেকে কল্যাণীদির গান আসে:

'নীল যমুনার জল, বল্ রে ওরে বল্
কোথায় আমার শ্যাম—'

হঠাৎ একটা ধড়াম করে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ল সুমন্তদা।

'মন্টু!'

বৈঠক দিতে দিতে আমি থমকে দাঁড়িয়ে গেলুম।

'সুমন্তদা, আপনি তো আর এক্সারসাইজ করেন না ক'দিন ধরে।'

'আমার শরীর ভালো নেই। অসুস্থ শরীরে ব্যায়াম করা উচিত নয়।'—সকালের আবছা আলো ফুটছে তখন, সেই আলোয় সুমন্তদাকে কেমন অদ্ভুত লাগল: 'তোর বৈঠ্কি শেষ হল?'

'আর পাঁচটা বাকি আছে।'

'থাক গে। ওতে কিছু যায় আসে না। চল্ আমার সঙ্গে।'

'কোথায় ?'

'বাইরে। তোর সঙ্গে আমার কথা আছে।'

সুমন্তদার চোখদুটো যেন জ্বলছিল—আমার ভয় করতে লাগল। আমি বললুম, 'কোথায় ?'

'নিশ্চয়ই দরকার আছে কোনো।'—সুমন্তদা মুখ বিকৃত করল: 'আর কানের কাছে পেত্নীর মতো সমানে হাঁ হাঁ করে গান গাইছে ওই মেয়েটা, ভালো লাগে কারো ?'

বিস্ময় অতল।

কল্যাণীদির গান পেত্নীর মতো। অথচ সবাই তো ভালো বলে। আমাদের বাড়িতে এসেও তো ক'দিন গান শুনিয়েছে, বাবা পর্যন্ত কত খুশি হয়েছেন। আর কতবার সুমন্তদা নিজে বলেছেন, 'মেয়েটার গলা খুব চমৎকার রে—যা দরকার তা হল একটু তালিম। খুব ভালো গাইতে পারবে তা হলে।

সেই কল্যাণীদির গান পেত্নীর মতো। আমি হাঁ করে তাকিয়ে রইলুম।

'বোকার মতো তাকিয়ে আছিস কী ? ও গান যেখানে শোনা যায় না—চল্ সেখানে।'

কিছুই বুঝতে না পেরে—সদর খুলে আমি সুমন্তদার সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এলুম।

খানিকটা হেঁটে—খেলার মাঠ আর বকুল গাছগুলো পার হয়ে আমরা আত্রাইয়ের ধারে এসে দাঁড়ালুম। চারদিক সাদা হয়ে আসছে, রঙ পড়েছে আকাশে, ওপার থেকে খেয়া ছেড়েছে বন্দরের দিকে। নদীর ওপরে একটা হালকা কুয়াশা—নৌকোটাকে, মানুষগুলোকে ছায়ার মতো দেখাচ্ছে এখান থেকে।

হাওয়ায় সুমন্তদার রুক্ষ চুলগুলো উড়তে লাগল, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সে। তারপর বললে, 'মন্টু !'

'উঁ।'

'মানুষ হয়ে জন্মানোর চাইতে কুকুর হওয়া ভালো, বুঝলি ?'

'সে কি!'

সুমন্তদা জবাব দিল না। আবার একটু চুপ করে থেকে বললে, 'একদিন মাঝরাতে আমি আত্রাইয়ের জলে নেমেছিলুম। কেন জানিস?'

'আপনার গা জ্বালা করছিল।'

'পুড়ে যাচ্ছিল, পাপে পুড়ে যাচ্ছিলুম আমি। এত অশুচি হয়ে গিয়েছিলুম যে ভরা নদীতে আমি ডুবে যেতে চেয়েছিলুম—যেমন করে সাঁতার শেখার আগে ডুবতে যাচ্ছিলি তুই। কিন্তু ভুলে গিয়েছিলুম—যে সাঁতার জানে সে জলে ডুবে মরতে পারে না।'

শুনে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল।

'সুমন্তদা, কিসের পাপ আপনার? কেন ডুবে মরবেন আপনি?'

'বলতে পারব না তোকে, কাউকে বলা যায় না সে-কথা। আর—আর একদিন আগে মাঝ রাতে আমায় কে ডেকেছিল, জানিস? শিউরে উঠে আমি বললুম, 'নিশি!'

'না—নিশি-টিশি কিচ্ছু নেই, ও-সব একেবারে বাজে কথা। আমাকে ডেকেছিল আমার পাপ।'

'পাপ!'—শুনে আর একবার হাঁ করে রইলুম আমি। এক-আধটা ছোটখাটো পাপ আমিও যে করি না তা নয়—একদিন অকারণ কৌতূহলে একটা থার্মোমিটার দেখতে গিয়ে—সেটা ভেঙে ফেলে অম্লান বদনে বলেছিলুম, 'আমি জানি না তো। একটা শাদা বেড়াল এসে জানলা দিয়ে লাফিয়ে টেবিলে পড়েছিল, সেই-ই ফেলে দিয়েছে হয়তো।' তা ছাড়া এক-আধটু আচার-আমসত্ত না চেয়ে আত্মসাৎ করা তো আছেই। কিন্তু সে-সব পাপ তো মাঝ রাত্তিরে এসে নাম ধরে ডাক দেয় না কোনোদিন।

সুমন্তদা ওপরের দাঁতের পাটি দিয়ে নীচের ঠোঁটটাকে চেপে ধরল।

'পাপ—আমার পাপ। মনে হল ছুটে যাই পাঠক-দেউলের

জঙ্গলে—মায়ের পায়ে গিয়ে আছড়ে পড়ি। সেইজন্যেই বেরিয়ে পড়েছিলুম। বেরিয়েই বুঝতে পারলুম, আমি তো মানুষ নই, কুকুর হয়ে গেছি। এই অশুচি শরীর-মন নিয়ে কোথায় যাব—কার কাছে যাব? সাধকের ওই পীঠস্থানে আমি কি যেতে পারি আর? মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছিল, তবু যেন আমার সারা শরীর জ্বলে যেতে লাগল মশালের মতো। আমি কোথায় যাচ্ছি কী করছি—কিচ্ছু বুঝতে পারলুম না। ছুটে গেলুম ছোট জঙ্গলটার ভেতরে, ইচ্ছে করছিল টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলি মাথাটাকে। পাগলের মতো মাথাটাকে আছড়ে দিলুম একটা গাছের সঙ্গে, তারপর—'

তারপর আর কিছু বলবার দরকার ছিল না। বাকীটুকু আমার জানা।

'কাউকে বলবি না মণ্টু?'

'না সুমন্তদা। কিন্তু—' আমি কেঁদে ফেললুম: 'এখন কী করবেন আপনি?

'জানি না।'

'স্টিমারে সেই যে মহাপুরুষ স্বপ্ন দিয়েছিলেন—'

'জোচ্চোর।'

'অ্যাঁ!'

'মেয়েমানুষের মতো কাঁদিস নি মণ্টু, বাড়ি চল।'

কিন্তু বাড়ির কাছে এসেও ঢুকল না সুমন্তদা। কল্যাণীদি তখনো গান করছিল:

'নয়ন য'দিন রইবে বেঁচে, তোমার
পানেই চাইব গো,
কইতে কথা পারব যদিন—'

তীরবেগে ফিরে দাঁড়ালো সুমন্তদা।

'তুই বাড়ি যা মণ্টু। আমার কাজ আছে একটু।'

আমি থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম কিছুক্ষণ। তারপর মনে হল, বাবাই ঠিক বলেছিলেন—সুমন্তদা পাগল হয়ে যাচ্ছে।

॥ আট ॥

'নীল যমুনার জল, বল্ রে ওরে বল্—'

যমুনা আমি দেখেছি বড় হয়ে। নীল তার জল। কিন্তু তারও চেয়ে অনেক নীল সমুদ্র। যমুনার জলে যে জ্বালা নেবে না, এই সমুদ্র তাকে কোথায় মুছে নিয়ে যায়, কোন অতলের ভেতরে তলিয়ে দেয় তাকে। তাই কি এস কে ঘোষম এই সমুদ্রের ধারে এসেই আশ্রয় নিয়েছেন ?

কিন্তু কল্যাণীদি ? তারও যমুনা কি এই সমুদ্রে এসে মিশেছে শেষ পর্যন্ত ? তারও কি জ্বালা ছিল সুমন্তদার মতো ? কিংবা তার চাইতেও বেশি ?

আজ বিকেলে গিয়ে—ঘড়িটা আনবার সময় আমি সে-কথা কি জিজ্ঞেস করতে পারি এস কে ঘোষম্‌কে ? পারি কি ?

তার আগে ছবির সারির শেষে এসে দাঁড়াই। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর আর উজ্জ্বল ছবিটা। সেই ছবির সঙ্গে আমারও কী দারুণ দুঃস্বপ্ন জেগে আছে !

বারোয়ারি মণ্ডপে ঝলমল করছে প্রতিমা, ঝিকমিক করে জ্বলছে ঝাড়ের আলোয় ডাকের সাজ।

আর নাট-মন্দিরে জমাট অভিনয়। যত দূর মনে পড়ছে, পালার নাম নরমেধ যজ্ঞ।'

দীপু মা-র কাছে, ওদিকে চিকের আড়ালে। আমি এদিকে আসরের সামনের সারিতে, বাবার পাশে। সুমন্তদা আসে নি, শরীর খারাপ, আর এসব যাত্রা তার ভালোই লাগে না। দীপু নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছে, ওটা বরাবরই একটু পরেই ঘুমিয়ে যায়। আমারও যে মধ্যে মধ্যে মাথা ঢুলে না এসেছে তা নয়—তবু প্রাণপণে ঘাড় সোজা করে বসে আছি আমি। অত্যন্ত রোমহর্ষক যাত্রা।

রাত তখন বোধ হয় তিনটের কাছাকাছি একটা নিদারুণ কিছু ঘটতে যাচ্ছে—জুরীদের বেহালায় দ্রুত গতিতে চলেছে ছড়ের টান। একটা কিছু ঘটবে, ভয়ঙ্কর কিছু ঘটবে।

ঘটল। কিন্তু যাত্রার আসরে নয়।

হঠাৎ ভীড় ঠেলে কোথা থেকে পাগলের মতো ছুটে এলেন ওভারসিয়ার জ্যাঠা। হরেন সেন।

'শিবেন, শিগগীর এসো।'

চমকে বাবা বললেন, 'কী হয়েছে ?'

জ্যাঠামশাই কী যেন বললেন বাবার কানে কানে।

বাবার মুখ ছাইয়ের মতো হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। একটা কথা বলতে পারলেন না মিনিটখানেক।

অসম্ভব, হতেই পারে না। সুমন্ত—

জ্যাঠামশাই আবার বললেন, 'তুমি এসো শিগগীর।'

বাবা আর দাঁড়ালেন না, উঠে ছুটে বেরিয়ে গেলেন, 'তুই থাক মণ্টু, যাত্রা শেষ হলে চাকরটা তোকে নিয়ে যাবে। আমি তোর মা-কে ডেকে নিয়ে এক্ষুণি বাড়ি চলে যাচ্ছি।'

'কী হয়েছে বাবা—' আমি জিজ্ঞেস করবার সময়ও পেলুম না। তার আগে বাবা চলে গেলেন আসরের বাইরে।

কিন্তু যাত্রা দেখার সুখ আমার চলে গিয়েছিল। সুমন্তদা! কী করেছে সুমন্তদা ? সেদিনকার প্রত্যেকটা কথা আমার মনে পড়ে যেতে লাগল। সেই পাপ! যে পাপের জন্যে সে আত্রাইয়ের জলে ডুবতে গিয়েছিল, ঠুকে মাথাটা ভাঙতে চেয়েছিল একটা গাছের সঙ্গে, সেই পাপই কি আজও—

সুমন্তদা কি ডুবে মরেছে ? টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলেছে নিজের মাথাটা ?

বুকের ভেতর হিম হয়ে গেল আমার, কান্নায় ঝাপসা হয়ে গেল চোখ। যাত্রায় কী হচ্ছে, কি দেখছি কিচ্ছু বুঝতে পারলুম না। ইচ্ছে করছিল এখনি ছুটে যাই বাড়িতে, কিন্তু বাবা যাত্রা শেষ না

হওয়া পর্যন্ত বসতে বলেছেন, আমাকে বসতেই হল। এমন যন্ত্রণা যেন জীবনে আর কখনো পাই নি আমি।

পাশ থেকে কে যেন বললেন, 'বাবা কোন কাজে গেছেন, ভয় কী খোকা? কাঁদছ কেন?

'না—না—কাঁদছি না তো।'

যাত্রা শেষ হতে না হতে তীরবেগে ছুটলুম আমি। চাকরের জন্যে অপেক্ষা করবার মতো মনের অবস্থা আমার নয় তখন।

তারপর সবটা যেন ঘূর্ণি।

হরেন জ্যাঠার বাড়ি থেকে কাদের যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ। মা ঘরের মেজেতে আঁচল বিছিয়ে মুখ ঢেকে শুয়ে আছেন। বাবা ইজিচেয়ারটায় কাঠ হয়ে বসে—বাড়ির সব ক'টা চেয়ারে মোড়ায় অমূল্য ডাক্তার, শশীবাবু, আরো কারা কারা সব বসে। একটি কথাও কেউ বলছেন না।

আমি বলে ফেললুম, 'সুমন্তদা—'

সব কটা চোখ ঘুরে গেল আমার দিকে। তারপর হঠাৎ ভয়ঙ্কর গলায় একটা ধমক দিলেন বাবা: 'চোপ একটা কথাও না—শুতে যাও মণ্টু!'

কিন্তু শোবার আর দরকার ছিল না। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই জানা হয়ে গেল। বাইরে ওঁরা কথা আরম্ভ করেছিলেন।

টুকরো টুকরো সেই সব আলোচনা থেকে বুঝতে কিছু বাকী রইল না আমার। সুমন্তদা শরীর খারাপ বলে যাত্রা দেখতে যায় নি। কল্যাণীদিরও নাকি খুব মাথা ধরেছিল, সেও যায় নি। মাঝ রাতে জ্যাঠাইমা ঝিকে পান আনতে পাঠিয়েছিলেন বাসায়। তারপর—

তারপর ঝিয়ের সন্দেহ ছিলই। একদিন নাকি কী সে দেখেও ছিল। কিন্তু সাহস করে বলতে পারে নি। সুমন্তদা অতি সচ্চরিত্র বলে বিখ্যাত, ধার্মিক মানুষ ধর্মের গান গায়—তার কথায় কে বিশ্বাস করবে! মাঝখান থেকে ঝিয়েরই চাকরি যেত।

কল্যাণীদিকে বাসায় না পেয়ে সে আসে আমাদের বাড়িতে। এখানেও কেউ নেই। তারও পরে।

বাবা চেঁচিয়ে উঠলেন : 'রাস্কেল—রাস্কেল! আমি এখনি চৌকিদার পাঠাচ্ছি চারদিকে। ধরে আনুক, তারপর নিজের হাতে আমি গুলী করব হারামজাদাকে।'

জ্যাঠামশাই বোধ হয় কাঁদছিলেন। বললেন 'না শিবেন না। কেলেঙ্কারী বাড়িয়ে আর লাভ নেই। ওরা তো নাবালক নয়। যে চুলোয় গেছে যাক, আমরা ভাবব ওরা মরে গেছে। কিন্তু কেবল ভাবছি—কল্যাণীর মা-বাপকে—'

'আমিই বা কী বলব ওই শুয়োরটার মাকে!'

আমি আর সহ্য করতে পারছিলুম না। সারা রাত জেগে থাকা উত্তপ্ত মাথাটা যেন ফেটে যেতে চাইছিল আমার। ইচ্ছে হল চীৎকার করে বলি না—না, এ সব মিথ্যে। সুমন্তদা কল্যাণীদিকে দেখতে পারে না, সে বলে ও পেত্নীর মতো গান করে। কল্যাণীদি যেখানে খুশি যাক, কিন্তু আমি জানি সুমন্তদা কোথায় গেছে। আমি জানি পাঠক দেউলের জঙ্গলে গিয়ে মায়ের পায়ে আশ্রয় নিয়েছে সে—যে মা তার মনের সব দুঃখ, সব পাপ কেড়ে নিয়ে তাকে শান্তি দেবেন।

আমি চীৎকার করে বলতে চাইলুম, বলতে পারলুম না। জানি কেউ আমার কথা বিশ্বাস করবে না। আমি ছেলেমানুষ বলে এক ধমকে থামিয়ে দেবেন আমাকে। তা হলে—তা হলে তার আগে আমি সুমন্তদাকে ফিরিয়ে আনব। গিয়ে বলব, আপনি অন্তত একবারের জন্য ফিরে আসুন, এই কদর্য মিথ্যাটাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়ে যান, তারপর মায়ের আশ্রয় তো আপনার রইলই।

আমি বেরিয়ে এলুম ঘর থেকে।

তখনো সকাল হয় নি, তখনো আকাশে হীরের মতো ধক্ ধক্ করছে শুকতারা। উঠোনের ভিজে মাটির গন্ধ, বাগান থেকে

শিউলির গন্ধ, ভোরের হাওয়ায় পেয়ারা আর সজনে গাছের পাতা থেকে টুপটুপ করে শিশির পড়া।

ওঁরা নিজেদের মধ্যে কথায় তন্ময়। আমাকে দেখলেন কি না জানি না। দেখলেও লক্ষ্য করলেন না কেউ।

ঝড় চলছিল আমার মাথার ভেতরে—পাঠক দেউলের জঙ্গল ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছিলুম না। ছুটেই চলে যেতে চাইছিলুম, হঠাৎ দোরগোড়ায় দেখলুম শশীবাবুর সাইকেলটা। একবার জিজ্ঞেস করার কথাও মনে হল না—আর জিজ্ঞেস করলে কে যেতে দেবে! সেই সাইকেলটা নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লুম পাঠক দেউলের বনের দিকে।

তখনো কুয়াশা—আত্রায়ের এপার-ওপার ধোঁয়ায় ঢাকা। পথে যাত্রা-ফেরৎ মানুষের চলা। যাত্রার গানও গুনগুন করছিল তাদের কেউ কেউ। আমি কিছু দেখছিলুম না, কিছু শুনছিলুম না। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে প্যাডল করে চললুম বালুরঘাটের রাস্তার দিকে।

হাওয়ায় শীত—কান দুটো কনকন করছে। গোরুর গাড়ির রাস্তায় সাইকেল চলতে চায় না, এখানে-ওখানে কাদা জমে আছে, দু'বার পড়ে গেলুম সাইকেল নিয়ে। টের পেলুম আমার হাঁটু ছড়ে গিয়ে রক্ত পড়ছে, তবু আমার কোনো অনুভূতি ছিল না। ধূলো, মধ্যে মধ্যে কাদা—এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় সাইকেল চালাতে আমার পা দু'টো ছিঁড়ে পড়ছিল, বুকে দম পাচ্ছিলুম না, থেকে থেকে ধোঁয়া-ধোঁয়া হয়ে আসছিল চোখ।

তবু থামবার উপায় নেই। এক মুহূর্ত থামতে পারব না আমি। কখন পেরিয়ে গেল সেই বোঁদের দোকান, কোথায় ফেলে এলুম সেই ভয়ঙ্কর পাকুড় গাছটা—যার তলায় কুষ্ঠরোগী বুড়ীটাকে শেয়ালে খেয়েছিল। তারপর পথ ছেড়ে, মাঠে নেমে, আরো দু-বার আছাড় খেয়ে আমি এসে পৌঁছে গেলুম পাঠক দেউলের জঙ্গলে।

না, পথ ভুল করি নি। রাস্তা থেকেই জঙ্গলের বড় বড় গাছগুলোকে দেখা যায়।

আর সাইকেল চলে না, ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে পথ নেই কোথাও। এখন আলো ফুটেছে, গাছপালার মাথার ওপর ঝিলমিলিয়ে উঠেছে নরম রোদ—কিন্তু এখানে ছায়া, শীতল কালো ছায়া, শ্যাওলা পড়া—পরগাছা দোলা গাছের সার। তলায় ঠাণ্ডা মাটি, এখানে ওখানে কুয়াশা ছড়ানো, মাকড়সার জালে শিশির, গাছের পাতা থেকে শিশির টপছে। পাখির ডাকে ভরে গেছে সমস্ত বন—অথচ কী নির্জনতা—কী নির্জনতা!

একটা গাছের গায়ে সাইকেলটাকে ঠেসান দিয়ে আমি সেই নেশার ঘোরেই এগোতে লাগলুম মন্দিরটার দিকে। চলতে লাগলুম পাথর টপকে টপকে, একবারের জন্যে চোখে পড়ল সেই বেদীটার ধ্বংসস্তূপ—যেখানে এক সময় কত নরবলির রক্ত ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে!

সামনে মন্দির। কিছু দেখা যায় না—যেখানে দরজাটা ছিল, তার ভেতর দিয়ে হা-হা করছে অন্ধকার। সেই অন্ধকারে হাত ভাঙা পাথরের মূর্তিটা ছায়া হয়ে রক্ত জমা আতঙ্কের মতো দাঁড়িয়ে।

চিৎকার করে ডাকলুম, 'সুমন্তদা!'

গমগম করে উঠল চারদিক। কিন্তু কোনো সাড়া এল না।

আবার ডাকলুম 'সুমন্তদা!'

নিজের গলার স্বরটাই এমন বিকৃত, এমন অচেনা ঠেকল যে আমি চমকে উঠলুম। না—কোন সাড়া নেই কোথাও।

বাইরে থেকে অন্ধকার মন্দিরের সবটা দেখতে পাচ্ছি না তো। হয়তো এক কোণায় বসে আছে কোথাও—হয়তো—হয়তো আর কারো ডাকে সে সাড়া দেবে না।

কিন্তু সুমন্তদাকে আমার ফিরিয়ে নিয়ে যেতেই হবে। তার নামে এত বড় কুৎসা—এমন জঘন্য মিথ্যা আমি সইতে পারব না। জীবনকে তখনো আমি কিছুই জানি না, কিন্তু সেই বয়েস তো

আমার এসেছে যখন সব অজানা বিস্ময় অচেনা রহস্যের ওপর প্রথম আলো পড়তে শুরু করে—যখন সব কিছুর ওপর একটা অস্পষ্ট বোধের ছায়া পড়তে শুরু করে। তা ছাড়া স্কুলের বন্ধুরা—যাদের ভেতর সম্পন্ন চাষী-গৃহস্থের দু-একটি বয়স্ক ছেলেও ছিল, তাদের হাসি-ঠাট্টা, কথার ইঙ্গিত, নর নারীর নিভৃত জীবন সম্পর্কে টুকরো টুকরো মন্তব্য—তখনো আমার কাছে রূপকথা হয়েও একেবারে অবোধ্য ছিল না। সুমন্তদার কল্যাণীদিকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার কী অর্থ হতে পারে—

'সুমন্তদা'!

সাড়া এল না, কিন্তু আমি দেখতে পেলুম। অন্ধকারে তাকাতে তাকাতে অল্প বয়সের দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়ে এসেছিল অনেকখানি, ঠিক মনে হল, ভাঙা প্রতিমার একটা হাতের পাশ দিয়ে কী যেন পেছনে সরে গেল, তাকে নড়তে দেখলুম—যেন নিশ্বাসের শব্দও কানে এল।

লুকিয়ে আছে—প্রতিমার পেছনে লুকিয়ে আছে।

সিঁড়ি ছিল না, এক লাফে উঠে পড়লুম মন্দিরের চাতালে। ঢুকে পড়লুম মন্দিরের মধ্যে। ডাকলুম, 'সুমন্তদা, বেরিয়ে আসুন, আমি মন্ট, দারুণ দরকার—বেরিয়ে আসুন, আমি আপনাকে দেখতে—'

তখন বেরিয়ে এল সে। না—সুমন্তদা নয়!

প্রতিমার কাঁধের ওপর দিয়ে সে মুখ বার করল। তারপর দেখলুম, চিকচিক করে জ্বলছে তার চোখ, ফোঁস ফোঁস করে একটা নিশ্বাসের মতো আওয়াজ বেরুচ্ছে তার মুখ দিয়ে। আরো দেখলুম, প্রতিমার সারাটা গা জড়িয়ে পাকে পাকে বটের শিকড়ের মতো তার মোটা শরীর—সাপ! না—গোখরো নয়, তার চাইতে সে অনেক প্রকাণ্ড। অত বড় সাপ আমি কখনো দেখি নি।

কয়েক সেকেণ্ড আমি নড়তে পারলুম না—যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলুম। সাপের মুখটা প্রতিমার কাঁধ বেয়ে একেবারে

মাথার ওপর উঠল, তারপর সেখান থেকে দুটো জ্বলজ্বলে স্থির চোখে চেয়ে রইল আমার দিকে।

চিৎকার করে আমি পেছন দিকে লাফ দিলুম, ভাঙা দরজা, ভাঙা চাতাল পেরিয়ে এলুম, আর এক লাফে নেমে পড়লুম নীচে। কিন্তু হাত-পা-মাথা কিছুই আর নেই তখন—আমার মনে হল, কে যেন দুটো প্রকাণ্ড বাহুতে তুলে ধরে আছড়ে ফেলল মস্ত একটা পাথরের ওপর।

সিদ্ধ সাধকের মন্দিরে অনধিকারী ঢুকতে পারে না।

একবার আত্রাইয়ে ডুবতে গিয়ে, একবার প্রবোধ মণ্ডলের সেই মৃত্যুশয্যায়। আর একবার পাঠক দেউলের জঙ্গলে। এই তিনবার আমি জ্ঞান হারালুম। কিন্তু এবার আর সুমন্তদা ছিল না।

* * *

কিন্তু এখন বুঝেছি সাপটা দাঁড়াশ। ওদের আকারটাই ভয়ঙ্কর—মানুষকে ওরা কামড়ায় না। আর আমাকে সেই সকালে সাইকেল নিয়ে পাঠক দেউলের জঙ্গলে ঢুকতে দেখে দূর থেকে আশ্চর্য হয়েছিল সেই লোকটি—যে সকালেই বেরিয়েছিল কাস্তে নিয়ে, যে জোলো ঘাস কেটে কেটে আমাদের ঘোড়া দুটোকে জোগান দিতে যায়।

তা নইলে আজ ত্রিশ বছরেরও পরে আমার সঙ্গে এস কে ঘোষমের আর দেখা হত না।

সামনে সমুদ্রের জল রোদের রঙ নরম হয়ে এসেছে। লনের ইউক্যালিপ্টাসে হাওয়ার শব্দ, তাল-নারকেলের মর্মর, একটানা সমুদ্রের স্বর। সেদিনের আত্রাইয়ের জল এই সমুদ্রেও এসে মিশেছে—নিরন্তর এই নীলের মধ্যেও কোথাও সব হারানো দিনগুলো মিশে আছে আমার।

সুমন্ত ঘোষ—এস কে ঘোষম্। ওয়াচ মেকার্স অ্যাণ্ড রিপেয়ারারস। কিন্তু স্বামীজীর বাণী, কথামৃত, গীতা। মুকুন্দদাসের

গান: 'তুই না জাগিলে শ্যামা, কেহ জাগিবে না।' যে ডাকের জন্যে ঘর ছেড়েছিলেন, যার জন্যে অপেক্ষা করে বসেছিলেন সেই ডাক?

কে বলতে পারে—কোন্ ডাক কার কাছে কখন এসে পৌঁছোয়। এই সমুদ্রের জলই তো আর একটু এগিয়ে গিয়ে আছড়ে পড়েছে বিবেকানন্দ শিলায়। সবাইকেই সন্ন্যাসী হতে হবে, কী মানে আছে তার? সেবা ধর্ম তো কেবল সংসারত্যাগীরই একচেটে নয়। 'জীবে প্রেম করে যেই জন।' 'দে অলসো সার্ভ হু অনলি স্ট্যাণ্ড্ অ্যাণ্ড ওয়েট।'

কিন্তু কল্যাণীদি?

আজ সন্ধ্যায়—কিংবা কাল সকালে ঘড়িটা আনতে যাব যখন, তখন কি সে কথা আমি জিজ্ঞেস করতে পারি এস কে ঘোষম্‌কে? পারি কি? প্রশ্ন করতে পারি কি, এই সমুদ্রে কি কল্যাণীদিরও মুক্তি ঘটেছে।

সমুদ্রের একটানা মৃদঙ্গ বাজছে: 'তা থৈয়া তা থৈয়া নাচে ভোলা।' জীবন-মৃত্যুর সব বিস্ময়ের উত্তর আছে সেখানে, সব কথা লুকিয়ে আছে তার ভেতরে। কিন্তু সে রহস্য বোঝা যায় না, একটা কথাও বোঝা যায় না তার।

একটা মোটর সাইকেলের আওয়াজ এগিয়ে আসছে নীলম্ রোড দিয়ে। পিসেমশাই ফিরে আসছেন অফিস থেকে।

॥ শেষ ॥